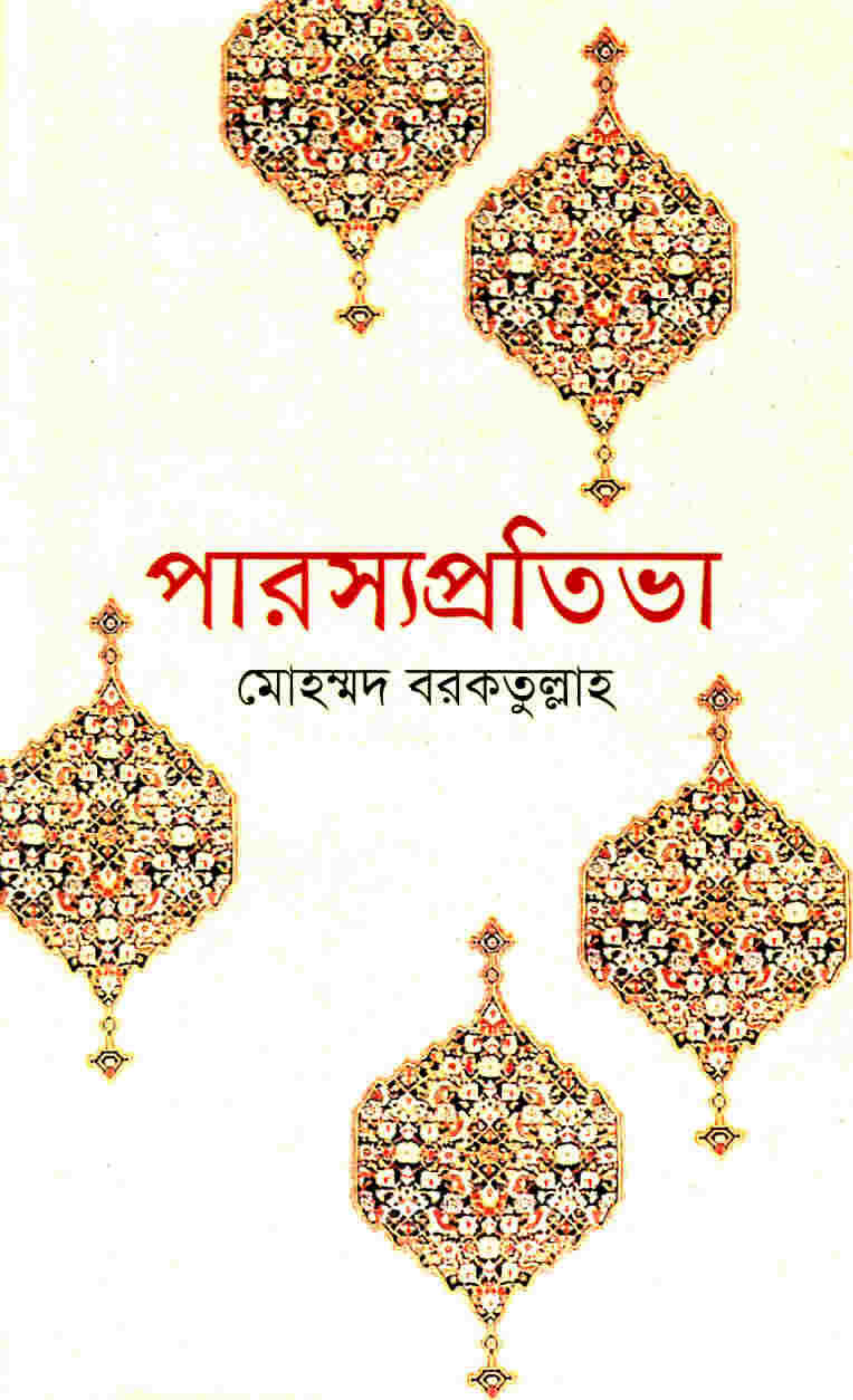

পারস্যপ্রতিভা

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

পারস্য প্রতিভা

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

পারস্য প্রতিভা

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ভাদ্র ১৪০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৭ ডিসেম্বর ২০১০

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৯ বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0117-5

ভূমিকা

পারস্য সাহিত্যের অমিত প্রতিভাধরদের সংস্পর্শে আসার আগে ঐ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া জরুরি—কেননা ইতিহাস ও সাহিত্যের পরস্পরের প্রেক্ষিত পরস্পরের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল।

আধুনিককালের ইরান দেশটি ১৯৩৫ সাল অবধি পশ্চিম তথা সারা বিশ্বেই 'পারসিয়া' বা পারস্য নামে পরিচিত ছিল। নামটির পেছনে উজ্জ্বল একটি ইতিহাস রয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে দেশটি আর্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়। পরবর্তীতে গ্রিক-বংশোদ্ভূত মেডেস এখানে 'মিডি' সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে 'ফার্স' নামে একটি প্রদেশ ছিল—পারসিক রাজবংশের আদি শেকড়ভূমি এখানেই। এখানকার অধিবাসীদের গ্রিক ঐতিহাসিকেরা (হেরোডোটাস প্রমুখ) পারসিস (Parsis) বা পার্সিয়ান (Parsian) বলতেন। এই পার্সিয়ানরা খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে তেইস্পেসের নেতৃত্বে গ্রিকদের হটিয়ে নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ করে।

তেইস্পেসের মৃত্যুর পর তাঁর বড়ছেলে প্রথম সাইরাস অসীম বীরত্ব ও প্রতিভা নিয়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হন। সেকালের পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রূপকার পারস্যের সাইরাস 'দ্যা গ্রেট' শুধু মিডি-সাম্রাজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি অত্যন্ত কৌশলে একে একে ইতিহাসখ্যাত লিডিয়া, ভূমধ্যসাগর উপকূলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গ্রিক নগর-রাষ্ট্র, তৎকালীন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর ব্যাবিলন এবং এর অধীন রাজ্যসমূহ অধিকার করে মিশরের প্রান্ত পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। পৃথিবীর বুকে পারসিয়ানদের দাপট তখন তুঙ্গে। কাইরাসের মৃত্যুর পর (খ্রি. পূ. ৫২৯) তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ক্যাম্বিসিস (খ্রি. পূ. ৫২৯-৫২২) জয় করেন প্রায় সমগ্র মিশর। ক্যাম্বিসিসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সেনাধ্যক্ষ দরিয়ুস 'দ্য গ্রেট' নামে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। নিজেদের সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃতি দিতে ইনি টোকা দিয়েছিলেন ভারত উপমহাদেশের দরোজা এবং জিতে নিয়েছিলেন সিন্ধুনদের উপকূল পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের বিশাল ভূখণ্ড। প্রথম পা রেখেছিলেন তিনি ইউরোপের মাটিতে। পারস্যের এই দরিয়ুস দ্য গ্রেট-ই ছিলেন সেই বিখ্যাত সম্রাট যিনি খ্রি. পূ. ৪৯০-এর ১২ আগস্ট লড়েছিলেন গ্রিকদের সঙ্গে কিংবদন্তির ম্যারাথনের যুদ্ধে। হেরেছিলেন যদিও কিন্তু 'ম্যারাথন' শব্দটি আজো ক্রীড়ামোদী মানুষের মুখে-মুখে ফেরে। দরিয়ুসের মৃত্যুর পর এলেন তাঁর বড়ছেলে যেরক্সে (খ্রি. পূ. ৪৮৬-৪৬৫)। যৌবনকালে তিনি ব্যাবিলনের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ম্যারাথনের যুদ্ধে গ্রিকদের কাছে পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধে তিনি বের হয়েছিলেন। জয় করেছিলেন সমগ্র গ্রিস (৪৮০ খ্রি. পূ.)। হিংস্রের মতো লুটপাট শেষে জ্বালিয়ে ছাই করে দিলেন রাজধানী নগর এথেন্স।

যেরক্সের মৃত্যুর পর যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁরা সকলেই তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিভার। পারস্য সাম্রাজ্য তারপর বিবিধ কারণে আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে।

এরপর ইতিহাসে নেমে আসেন নতুন নায়ক আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

সেই থেকে ওই প্রদেশটির নামানুসারে সমগ্র দেশটি (সেই সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যটিই) পারসিয়া (প্রাচ্যে পারস্য) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। যদিও পারস্যের অধিবাসীরা আগাগোড়াই নিজেদের দেশকে ইরান আর নিজেদেরকে ইরানি বলে জানেন।

সম্ভবত পারসিয়ান সাম্রাজ্যের কাছে দীর্ঘকাল মাথা নিচু করে থাকা গ্রিকদের সুপ্ত প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি থেকেই মহাবীর আলেকজান্ডার বিশ্ববিজয়ে বের হয়েছিলেন। পারস্য বিজয় করেছিলেন তিনি ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু আলেকজান্ডারের অকালমৃত্যু তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং সেগুলো শাসন করতে থাকে তাঁরই সেনাপতি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতাবান রাজবংশরা।

অবশেষে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাডেশিয়ার সমরক্ষেত্রে স্থানীয় সাসানিয়া রাজবংশের পরাজয়ের মাধ্যমে পারস্যের স্বাধীনতা দীর্ঘকালের জন্য বিপন্ন হয়। এদেরকে উৎখাত করেন মুসলিম আরবরা তাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির বিবিধ বেষ্টনীর মাধ্যমে। আধুনিক ইরানের ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয় অনেকটা এখান থেকেই।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে পারসিকদের, অন্তত আদিতে, মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিল প্রাচীন পারসিক। এটি ইরানি ভাষার দক্ষিণ-পশ্চিম কথ্যরূপ। এই ভাষাতেই কথা বলতেন সম্রাট সাইরাস, দরিয়ুস। সম্ভবত খ্রি. পূ. ৬০০ নাগাদ ইরানে আবির্ভূত হয়েছিলেন একজন ইরানি ধর্মীয় দার্শনিক ও শিক্ষক—জরাথুস্ত্র। ধর্মকে তিনি দেবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূজাবিধির মধ্যে সীমিত না-রেখে তার অধিকার-সীমা বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন সামাজিক শুভ-র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের স্তর পর্যন্ত। জরাথুস্ত্র প্রয়াসী হয়েছিলেন ইরানি জনসমাজকে তাদের প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে সুনীতিপূর্ণ জীবনচর্যামুখী করে তুলতে। জরাথুস্ত্র ছাড়াও প্রাচীন ইরানে মাজদাকি ধর্ম ও মানিকিয়ান ধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। এই তিনটি ধর্ম, বিশেষ করে মানির প্রচলিত ধর্মটি ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করে এবং আজো দানিয়ুব অববাহিকায় এই ধর্মের ক্ষীয়মাণ ধারাটি বহমান রয়েছে।

এই ধর্ম প্রচারের জন্য মানিকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি একজন কুশলী চিত্রকরও ছিলেন। দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি ভারত ও চিনে গমন করেন। তিনি চিনে চিত্রকলা ও বিশেষ করে কারুশিল্পে গবেষণা করেন। তাঁর শিল্পকলায় চৈনিক ও ইরানি সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। আজ পাক-ভারতে চিন-ইরানি কারুশিল্পের যে-ধারাটি পরিদৃষ্ট হয় মানি ছিলেন তার জনক। আর বিশ্বনন্দিত পারসি কারু ও চারুশিল্পেরও শ্রেষ্ঠতম হোতা ছিলেন তিনি।

ইরানের ধর্ম, সংস্কৃতি ও বীরত্বের উপরোক্ত রূপরেখা থেকে তাঁদের মন ও মননের একটা রেখাচিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। আর সে চিত্র হচ্ছে এক স্বাধীনচেতা, ধর্মপ্রাণ ও শিল্পরসিক জাতির। তাঁদের সৌন্দর্যচেতনা ও অভিব্যক্তি সমগ্র জগৎকে মোহিত করেছে।

ইরানে আদি সাহিত্যের নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। সম্ভবত বিচিত্র বর্গী শাসকদের কোপানলে পড়ে সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা

মত প্রকাশ করেন। ধর্মভিত্তিক প্রাচীন সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন যে-গ্রন্থখানি পাওয়া গেছে নাম তার *জেন্দাবেস্তা। জেন্দাবেস্তা হচ্ছে* উপরোল্লিখিত জরাথুস্ত্রের ধর্মগ্রন্থ। এর মধ্যে জরাথুস্ত্রের দেবতা 'মিত্র'র প্রশংসা ও প্রার্থনাবিষয়ক অনেক সুন্দর সুন্দর গাথা রয়েছে।

পর্বতগাত্রে খোদিত অনুশাসনে ইরানি সাহিত্যের কিছু কিছু রচনার নমুনা রয়েছে। বিশেষ করে 'নক্‌শে রুস্তম' ও 'বিহন' পারসোপোলিক রাজাদের অনুশাসন প্রাচীন ইরানি গদ্যের পরিচয় বহন করে।

সাসানিয় যুগে প্রাচীন ইরানি ভাষায় রচনা শুরু হয়। সাসানি আমলের বাদশাহেরা পাহ্‌লভি ভাষা সমৃদ্ধ করবার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইরানের প্রাচীন ভাষা ছিল পাহ্‌লভি ও হরফগুলো ছিল পাহ্‌লভি হরফ। এই হরফগুলো সংস্কৃত হরফের মতো কিছুটা কিম্ভূতকিমাকার দেখতে।

মূলত মুসলিম বিজয়ের পূর্ববর্তী কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য প্রাচীন পারস্যে বর্তমান ছিল কি না, সাসানিয়া বংশের রাজত্বকালে তাদেরই নির্দেশে রচিত দু-চারটে কবিতা ভিন্ন তার অন্য কোনো নিদর্শন আজ আর বিদ্যমান নেই।

৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সাসানিয়া রাজবংশ সমূলে উৎপাটিত হয়। তাঁদের উৎখাত করেন বিজেতা মুসলিম আরবরা কাদেসিয়া রণাঙ্গনে। বিজেতারা পারস্য দেশের প্রচলিত ভাষা ও হরফের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। ফলে পাহ্‌লভি হরফের পরিবর্তে আরবি হরফে পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা শুরু হয়। দেখা যায় যে পাহ্‌লভি ভাষায় যে-সাহিত্যধারাটির উন্মেষ হয়েছিল, সেটাই পরবর্তীকালে আরবি হরফ ও ভাষার আশ্রয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, আরব-ইরানি সংস্কৃতি ও ইসলামধর্ম যৌথভাবে এই দেশের সাহিত্যমানস গঠনে সক্রিয় ছিল। ফলে তাঁদের মৌল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রসবোধ পরিণত হতে পারেনি বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

আব্বাসীয় খলিফারা বাগদাদে অপ্রতিহত প্রতাপের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় একটি অভূতপূর্ব মহাসমারোহ পড়ে গিয়েছিল। 'বায়তুল হিকমত' (জ্ঞানগৃহ) নামক রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থার উদ্যোগে দেশী ও বিদেশী (ভারতীয় ও সিরীয়) পণ্ডিতদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ এখানে ঘটেছিল। তাঁরা ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, গ্রিক দর্শন ও অন্যান্য ধরনেরও জ্ঞান সাধনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। শেষপর্যন্ত পারসিকদের মধ্যেও এই জ্ঞানচর্চার নেশা দেখা দেয়। তাঁরা প্রথম প্রথম আরবি ভাষার চর্চা করেন এবং নিজেরাই গভীর ও মৌলিক গ্রন্থাবলি রচনা করে জাতীয় জ্ঞান আহরণের ধারাটিকে সতেজ রাখেন।

দশম শতাব্দীতে বাগদাদের আব্বাসীয় রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সমূলে উৎখাত হয় বর্বর মোঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণে। বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে তৈরি হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশ, পারস্যও ফিরে পেল তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। মোঙ্গলদের এই প্রলয়-উল্লাসের মধ্যেই নবজন্ম লাভ করল পারসি সাহিত্য। মুসলিম বিজয়ের পর পারস্যের নিজস্ব ভাষা পাহ্‌লভি আরবির প্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল। এখন তারা পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হয়ে নিজেদের ভাষা, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হল। ফের্দৌসি তো তাঁর সমগ্র শাহনামা গ্রন্থটি রচনা করেন পাহ্‌লভি ভাষায়। যার মধ্যে ছিল ইরানের

ইতিহাসের প্রায় বিস্মৃত গৌরবের অধ্যায়গুলি। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে পারস্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, একাদশ শতাব্দীতে তিনজন প্রবলপ্রতাপ নরপতির বিদ্যোৎসাহে তা পূর্ণতা লাভ করে। পারস্যে মালেক শাহ্, গজনিতে সুলতান মাহমুদ এবং তার উত্তরাধিকারী কাদের-বিন-ইব্রাহিম এবং তুর্কিস্থানে কাদির খান—এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের রাজধানীকে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাদপীঠে পরিণত করেন।

আধুনিক ইরানের আদি ইতিহাসে যেমন আমরা বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখতে পাই, দেখতে পাই যেমন দিগ্বিজয়ী প্রতিভাবান পারসীয় বীরদের—ঠিক এরকমভাবে এবার যারা পারস্যের ভূমিতে আবির্ভূত হলেন তাঁরা কেউ সাম্রাজ্যবিস্তারী দিগ্বিজয়ী বীর নন, অথচ যেন বীরের অধিক। এঁরা কাব্য-সাম্রাজ্যের একেকজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। কে না পরিচিত—ওমর খাইয়াম, শেখ সাদী, মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী, শামসুদ্দিন হাফেজের নামের সঙ্গে! বিশ্বসাহিত্যে এঁরা প্রত্যেকেই অমরত্বের স্থান দখল করে আছেন। *পারস্য প্রতিভায়* মূলত একেকজন কবিকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে একেকটি প্রাণোন্মাদক রচনা। এই গ্রন্থের নেশা-ধরিয়ে-দেয়া গীতল ভাষায় একবার দৃষ্টিপাত করলে শেষ না-করে ওঠা পর্যন্ত পাঠকের নিস্তার নেই। বরং পারস্য সাহিত্যের সঙ্গে আরো অধিক পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে হৃদয়ে।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় খণ্ড। *পারস্য প্রতিভা* বইটি দুই খণ্ডে রচিত। ১১ জন কবির জীবন ও কাব্য-পরিচয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই দুই খণ্ডে। এর মধ্য থেকে ৬ জন কবির জীবন ও কাব্য-পরিচয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এই সংস্করণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে রচনার অনন্যতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে। এতে পারস্য কবিদের রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ আলোচিত হয়েছে তাঁদের কবিতা এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। আর এই উদ্দেশ্যটি সফল করতে গিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ যে ভাষা, কৌশল এবং শ্রম স্বীকার করেছেন তাতেই পারস্য সাহিত্যের অন্তরাত্মার সহজ ছবিটিও পাঠকের হৃদয়ে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে। লেখক যেন উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমান হৃদয়ের মাহাত্ম্য ও গভীরতা বুঝতে হলে পারস্য সাহিত্যের ফের্দৌসি, হাফেজ, ওমর খাইয়াম, শেখ সাদী, জালালউদ্দীন রুমী ও জামির হৃদয়টাকেই বুঝতে হবে। কেননা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উৎসারিত হয় হৃদয় থেকেই, কবিতা প্রাণ পায় কবির অমিত প্রাণ থেকেই। ফলত কবির জীবনের সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার কাব্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক উল্লিখিত কাজটিই যেভাবে সমাধান করেছেন তাতে গ্রন্থকারের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির অসামান্যতাও এখানেই। সাহিত্যের ইতিহাসও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা' যেন তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "...আপনার প্রবন্ধ-গ্রন্থটির গদ্যরীতি এতই চমৎকার যে আমি এটি পাঠ করতে গিয়ে উপন্যাস পাঠের আনন্দ পেয়েছি। অন্য যে-দিকটি আমার কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে সেটি হল সমগ্র বইটি পর্যালোচিত হয়েছে একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সত্যি বলতে কী একটি দূরদেশের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা

করার প্রতিটি মুহূর্তে আপনার মধ্যে সপ্রাণ ছিল আপনার স্বদেশভূমিটি। মাতৃভূমির প্রতি আপনার হৃদয়ের এই নিবিড়তা আপনার গ্রন্থের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক।... আমি আপনার প্রতিভা ও মননের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি... ।'

'পারস্য প্রতিভা' প্রকাশের পরপরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এর কোনো-না-কোনো অংশ ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমেডিয়েটের বাংলা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থেকেছে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে। 'পারস্য প্রতিভা' পারস্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী রচনা তো বটেই—এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এর ভাষা এবং রচনাকৌশল। ভাষার মাধুর্যে, বর্ণনা-চাতুর্যে ও ভাবের প্রাচুর্যে এই বইটি সেদিন যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, 'পারস্য প্রতিভা'র সেই ঔজ্জ্বল্যে আজো এতটুকু মলিনতার ছায়া পড়েনি।

দুই

বাংলাসাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে বাঙালি মুসলমানদের আবির্ভাব-লগ্নে যে কয়েকজন মুসলিম লেখক স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের আসরে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ অন্যতম। বাঙালি মুসলিম জাগরণের মুখে চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর আগমন ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা'র সাফল্য এরই সাক্ষ্য বহন করে। সেকালের অনেক কট্টর সমালোচককেও গ্রন্থটি আলোড়িত করেছিল।

'পারস্য প্রতিভা'র পর ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি। এটি তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য লেখককে ভূয়সী প্রশংসা করেন : "বাংলা সাহিত্য কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাস্তব ও আদর্শকে জনসাধারণের সমক্ষে আনিতে অধিকতর চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান ও দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিদ্যা আজ উপন্যাস ও কবিতার সহিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় সমান স্থান পাইতেছে ও তাহাদের পাঠকেরও অভাব ঘটিতেছে না। ...যে সকল লেখক বঙ্গসাহিত্যকে স্বাবলম্বী হইতে সহায়তা করিয়াছেন 'পারস্য প্রতিভা'র লেখক বরকতুল্লাহ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। ...যাঁহারা মনে করেন সংস্কৃতবহুল বাঙলা ভাষা অসংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে লেখা বা বোঝা দুষ্কর তাঁহাদিগকে আমি এই পুস্তিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই মোহম্মদ বরকতুল্লাহর সৃষ্টিকর্মে কেমন যেন ভাটা পড়ে এসেছিল। এরপর দীর্ঘদিন (প্রায় তেইশ বছর) তিনি একরকম সাহিত্যিক নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালে তাঁর 'কারবালা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে দীর্ঘকালব্যাপী নৈষ্কর্মের অবসান ঘটে। এরপর ১৯৬০ সালে 'নবীগৃহ সংবাদ', ১৯৬৩ সালে 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (দ.)' এবং ১৯৬৯ সালে 'হযরত ওসমান' প্রকাশিত হয়। যদিও এই গ্রন্থগুলিতে 'পারস্য প্রতিভা'র মতো

রচনাশৈলী ও মননের পরিচয় ফুটে ওঠেনি।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ২ মার্চ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার ঘোড়াশাল গ্রামে। তাঁর পিতা হাজী আজম আলী ছিলেন কবিরাজি চিকিৎসক, মায়ের নাম তসিরন বিবি। ছাত্র হিসেবে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ শৈশব থেকেই মেধাবী ছিলেন। শাহজাদপুর হাই ইংলিশ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯১৮-তে দর্শনে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাস করেন। ১৯২০-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এমএ পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯২২-এ 'ল' পাস করে পরবর্তী বছরে ওকালতির সনদ লাভ করেন তিনি।

১৯২৩ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। এখানে খাপ খাওয়াতে না-পেরে পরের বছর তিনি বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিও, জেলা প্রশাসক, কখনো-বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের আগে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। সবশেষে ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে একাডেমীর বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

শহিদুল আলম
২২/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
হাতিরপুল, ঢাকা

সূচি

পারস্য-সাহিত্য ১৩
কবি ফের্দৌসী ১৯
ওমর খাইয়াম ৩৫
শেখ সাদি ৫৭
কবি হাফেজ ৭২
জালালউদ্দীন রুমী ৮৭
ফরিদউদ্দীন আত্তার ১০১

পারস্য-সাহিত্য

আলবোর্জ গিরিশ্রেণীর পাদমূল হইতে আরব সাগরের তটদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল পারস্যভূমি কতকাল পূর্বে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ইতিহাস সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। আর্য-অধ্যুষিত এই ইরান-ভূমিতে যখন বেদ ও গায়ত্রীর সুমধুর শ্লোকমালা গীত হইত, আর্যবধূগণ যখন কাঁসর-ঘণ্টা নিনাদিত করিয়া গৃহে গৃহে সন্ধ্যা-আরতি প্রদান করিত, সেদিনের ইতিহাস যজুর্বেদও ভালোরূপে বলিতে পারে না। এই শস্য-শ্যামলা সুবিস্তৃত বঙ্গভূমি যখন ভারত মহাসাগরের অতল গর্ভে নিদ্রিত ছিল, জনবিরল আর্যাবর্তের ক্ষীণ কোলাহল যখন হিমাদ্রির কাননে কাননে গন্ধর্ব ও কিন্নর-কন্যাগণের ক্রীড়ার কোনো ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না, তাহারও বহুপূর্বে পারসিকগণ গৃহে গৃহে তাহাদের উপাস্য ব্রহ্মার যে অনল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজিও নাকি অনেক পুরাতন পারসিক বংশে তাহার নিরবচ্ছিন্ন শিখা নির্বাণ লাভ করে নাই। যে-সময়ে এই বিশাল দেশ বাবিলনের গ্রিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রিসীয় সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তখনও ইহার জাতীয় দেবতার অনল-সিংহাসন অক্ষুণ্ণ অবস্থায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া পারসিকদিগের প্রাণের ভিতর কতই-না আশা ও উন্মাদনার লহরি প্রবাহিত করিত। তার পর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবদেশে যে নবধর্মের অভ্যুত্থান হয় তাহারই প্রভাবে সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যের জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অর্ধ শতাব্দীর ভিতর আরবের পূর্ব সীমা হইতে কাবুলের প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার পতপত রবে মুখরিত হইয়া ওঠে; আর যাঁহারা জাতীয় ধর্ম বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুকুশে গিয়া নব জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যাডিশিয়ার সমরক্ষেত্রে যেদিন পারস্যের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়, সেই দিনেই সেই শোণিত-ক্ষেত্রে পারসিকদিগের প্রাচীন সাহিত্যেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই সময়ের পূর্ববর্তী কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য প্রাচীন পারস্যে বর্তমান ছিল কিনা, শাশানীয়া বংশের রাজত্বকালে তাঁহাদেরই নির্দেশে রচিত দুই-চারিটি কবিতা ভিন্ন তাহার অন্য কোনো নিদর্শন আজ আর বিদ্যমান নাই। পারস্যের অভ্যন্তরীণ যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব মুসলমানদিগের এই বিজয়লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল তাহাই পারসিকদিগের প্রাচীন সাহিত্যের ধ্বংসেরও কারণ হইয়াছিল।[১] পারস্যের আরবীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও প্রায় তিনশত বৎসর এই নব শাসকসম্প্রদায় পারস্যের সাহিত্যসমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কেননা, এই সময়ে পারস্য বাগদাদ-খলিফার একচ্ছত্র শাসনাধীন থাকায় পারস্যের প্রতিনিধি শাসনকর্তাগণ

---

[১] কেহ কেহ অনুমান করেন যে বিজয়ী আরবগণই পারস্যের (এবং মিশরের) প্রাচীন সাহিত্য ধ্বংস করিয়াছিলেন; কিন্তু গীবন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইহার অমূলকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

পারস্যের জনসাধারণের সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। জাতীয় জীবনের অস্থিমজ্জাকে অসাড় করিয়া তুলিবার পক্ষে পরাধীনতার যে-প্রভাব, বাগদাদের ন্যায়দর্শী খলিফার অধীন থাকিয়াও পারস্য উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে নাই। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাগদাদের বিশাল সাম্রাজ্য যখন বহুসংখ্যক খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় পারস্যে নবীন স্বাধীনতার আলোকে প্রকৃতভাবে নবযুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে পারস্যের মুসলমান নরপতিগণ তত্রত্য সাহিত্যের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নবান হন। ইহাদের প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক পারস্য কবিকে আশ্রয় ও বৃত্তি দান করিয়া স্ব স্ব সভার গৌরব বর্ধন করিতেন। পারস্য কবিগণ বিজয়ী আরবদিগের সন্তোষ বিধানার্থ প্রভূত পরিমাণে আরবীয় সাহিত্যের চর্চা করিতেন এবং স্ব স্ব রচনায় ভূরি ভূরি আরবীয় শব্দ ও আরবি ভাব প্রবিষ্ট করিয়া উহা শাসকসম্প্রদায়ের সহজবোধ্য করিয়া তুলিতেন।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে পারস্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে নব সাহিত্যের অভ্যুত্থান হয়, একাদশ শতাব্দীতে তিনজন প্রবলপ্রতাপ নরপতির বিদ্যোৎসাহে উহা পল্লবিত ও মুঞ্জরিত হয়। পারস্যে মালেক শাহ্, গজনীতে সুলতান মাহমুদ ও তদীয় উত্তরাধিকারী কাদের-বিন-ইব্রাহিম এবং তুর্কিস্থানে কাদির খান—ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব রাজধানীকে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের (চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়নশাস্ত্রাদি) পাদপীঠে পরিণত করেন। নিজাম-উল মুল্‌কের ন্যায় লেখক ও ওমর খাইয়ামের ন্যায় কবি মালেক শাহ্‌র রাজধানী খোরাসানকে তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছিল। সুলতান মাহ্‌মুদের সভাকবি ফেদৌসীর নামও জগতের ইতিহাসে অপরিচিত নহে। মুহম্মদ কাদির খাঁ এমনই শৌখিন ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যেমন বিবিধ মণিমুক্তাদি দ্বারা সর্বাঙ্গ বিভূষিত না-করিয়া কদাপি সভাগৃহে পদার্পণ করিতেন না, তেমনি তাঁহার সভাকবিগণও তাঁহার সমীপে দৈনন্দিন কবিতা পাঠ করিয়াও কোনোদিন রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেন বলিয়া শোনা যায় নাই। সাহিত্যের এমন সংবর্ধনা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ।

প্রাচীন মুসলমান নরপতিদিগের ভিতর কাহার সভায় কতজন কবি বা পণ্ডিত আছেন ইহা লইয়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই সকল রাজা নিজ নিজ সভাকবিগণকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়িতে চাহিতেন না। এমনকি সহজে বাধ্য না হইলে তাঁহাদিগকে বলপূর্বক রাজধানীতে আবদ্ধ রাখিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কথিত আছে পারস্যসম্রাট মনুচেহেরের সভাকবি খাকানি যখন সম্রাটের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ফকিরি গ্রহণ মানসে রাজসভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, মনুচেহের তখন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে যখন খাকানি কিছুতেই তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, তখন মনুচেহের অগত্যা তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কখনো কখনো ক্ষুব্ধ পলায়িত কবিকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনুতপ্ত রাজা অযাচিত ক্ষমা ও খেলাত সহকারে তাঁহার পশ্চাতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এমনও দেখা গিয়াছে। ফেদৌসীর সহিত সুলতান মাহমুদের ব্যবহার ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সুলতান মাহমুদ সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় দার্শনিক আবু-সিনার সুখ্যাতি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় জামাতার রাজধানী খারজামে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন। আবু-সিনা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া জর্জন প্রদেশে প্রস্থান করিলে সুলতান এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে তিনি আবু-সিনার তসবির সংগ্রহ করাইয়া তাহারই সাহায্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার

জন্য চতুর্দিকে অসংখ্য অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান মাহ্‌মুদের এত আগ্রহ সত্ত্বেও তদীয় বাসনা ফলবতী হয় নাই।

পারস্য সাহিত্যের সৌন্দর্য ও লালিত্য এতই চিত্তাকর্ষক যে দুর্বৃত্ত তাতারগণও ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুস্তান-বিজেতা সম্রাট বাবরশাহ নিজ মাতৃভাষা পশ্চাতে ফেলিয়া ফারসিকে ভারতের রাজভাষার গৌরবময় আসন প্রদান করেন। তদীয় পূর্বপুরুষ মহাতেজা তৈমুরের প্রলয়ঙ্কর হস্তে একদিন হাফেজের জন্য আশীর্বাদের খেলাত ও অগণিত মণিমুক্তা উঠিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় মহম্মদ যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন তাঁহার এই বিজয়োন্মত্ততার ভিতরও তিনি মহাকবি জামীর কবিতার আদর করিতে বিস্মৃত হন নাই।

গোলাবের দেশ পারস্য-যে বিধাতার সৃষ্টিকৌশলে কবিতাচর্চার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী এ-কথা বলাই বাহুল্য। পারস্যের সিরাজ নগরী যত কবির সূতিকাগৃহ অঙ্কে ধারণ করিয়াছে, একমাত্র এথেন্স ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনো নগরী তেমন করে নাই। এ নিমিত্ত পাশ্চাত্য লেখকগণ সিরাজকে Athens of Asia বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; আর সিরাজের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হাফেজকে তাঁহারা Anacreon of Persia বলিয়া থাকেন। হাফেজের রচনা পারস্যের আদর্শ-সাহিত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পারস্যের রচনায় যে-ক্রমোন্নতিশীল পরিবর্তন লক্ষিত হয়, হাফেজের পর হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচনায় আর তেমন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। প্রথমত পারস্য কবিগণ রাজপক্ষীয়দিগের মনোরঞ্জনার্থ আরবি ভাষার সবিশেষ চর্চা করিতেন এবং তাঁহাদের রচনায় প্রভূত পরিমাণে আরবি শব্দ ও আরবীয় ভাব প্রবিষ্ট করাইতেন। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কোনো কোনো শক্তিশালী লেখক চেষ্টাসহকারে আরবি শব্দ বর্জনকরত বিশুদ্ধ ফারসিতে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মহাকবি ফেরদৌসী এই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সমগ্র 'শাহনামা' বিশুদ্ধ ফারসিতে বিরচিত। প্রসিদ্ধ কবি খাকানিও তাঁহারই অনুকরণে অবিমিশ্র ফারসিতে কাব্য রচনা করিয়া অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

যাহা হউক, ক্রমে আরবি ভাব ও ভাষা পারসিকদিগের চক্ষে এমনই সহিয়া গিয়াছিল যে, একাদশ শতাব্দীর পর হইতে আরবির বিরুদ্ধে আর কেহই কোনোরূপ প্রতিকূলতা প্রকাশ করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি নেজামি এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেখ সাদি এবং মৌলানা রুমী—ইঁহারা প্রত্যেকেই আরবি ও ফারসি সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য একরূপ উঠাইয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়। এই সময়ের মধ্যেই কোরআন, হাদিস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আরবি হইতে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। পারস্যের জাতীয় সাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ চতুর্দশ শতাব্দীতে হাফেজের সময় পূর্ণতা লাভ করে। হাফেজের পর অনেক দিন পারস্য-সাহিত্যের গতিবিধিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। জামীর ইউসুফ-জোলায়খা পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা। উহার শব্দবিন্যাস ও রচনাভঙ্গি হাফেজেরই অনুরূপ। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পারস্য-সাহিত্যে আর একটি নূতন উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। তাতারদিগের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ভাবরাশি বহুল পরিমাণে পারস্য-সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত নাদির শাহের জীবনীতে এইপ্রকার তুর্কি-শব্দবহুল অভিনব ফারসি দৃষ্ট হয়। ভারতের রাজকীয় দপ্তরে স্থান লাভ করিয়া পারস্য-সাহিত্যের পরিসর অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে পারস্য-সাহিত্য সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরেজি ইত্যাদি সকল ভাষা হইতেই যে চৌর্য সংগ্রহ করিয়াছে, ইদানীন্তন পরিপুষ্ট ফারসিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল।

পারস্য-সাহিত্যের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। নদীর জলধারা যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, মানবজাতির চিন্তাধারাও তেমনি। উহা একবার এককূল ঘেঁষিয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে যতদূর সম্ভব সেইদিকে সিঁধিয়া যায়, তার পর আবার আপনাআপনি উহার গতিপথ পরিবর্তিত হইয়া প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্য পারের দিকে সমধিক বেগে ধাবমান হয়। প্রকৃতির বোধহয় ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কেননা সহজ সরল গতি নব নব সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে। বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন অধ্যায় ব্যাপিয়া মানবমনের যে ছাপটি পড়িয়া আছে তাহার বিসর্পিত আকৃতি এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। দার্শনিক কুলরবি হিগেল ইহাকে Dialectic Process বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতিই যুগে যুগে একবার ত্যাগের দিকে, একবার ভোগের দিকে প্রলুব্ধ হইতেছে। ভোগের লিপ্সা যখন চরমে উঠিয়াছে তখন ত্যাগের দিকে প্রেরণা আসিয়াছে। আবার ত্যাগের উৎকট অভিনয় মানবের জাতীয় জীবনে বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত করিয়াছে। কিন্তু এই শেষোক্ত ভোগলিপ্সার সহিত প্রথমোক্ত ভোগলিপ্সার অনেক প্রভেদ। কেননা, এবারের যে-তৃষ্ণা উহা ত্যাগের অভিজ্ঞতায় রঙিন ও প্রবৃদ্ধ। ইহাতে উদ্দাম আবেগ আছে, কিন্তু অর্বাচীনের অবিমৃশ্যকারিতা নাই। ইউরোপের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রিকদিগের জাতীয়-জীবন যেমন কৈশোরের চপলতায় উদ্দাম ও অসংযত, মধ্যযুগের ইউরোপীয় জীবন তেমনি কঠোর শাস্ত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত। আবার 'রিনেসঁর' নবালোকে খ্রিস্টীয় সমাজ আর একপ্রকার ঐতিহাসিক সাফল্য ও সম্ভোগের আরাধনা করিয়াছে। ইহারা জীবনকে সকল প্রকারে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেখিতে চাহে। সকল আকাঙ্ক্ষা সকল বাসনাকে ইহারা ফুটন্ত গোলাপের মতো রঙিন ও বিকশিত দেখিতে চাহে। ভারতে ও আরবে যুগে যুগে যে বিভিন্ন জাতীয়তার বিকাশ হইয়াছিল তাহারও ক্রমিক বিকাশের পর্যায়ে এই নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয় না।

পারস্য-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে, উহাদের পরস্পরের ভিতরকার ধর্ম ও ভাবগত সম্পর্ক ধরিতে হইলে, বিশ্বসাহিত্যের এই সাধারণ নিয়মটি আমাদিগকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। সাদির ভিতর আমরা ধর্মাচার ও সংযমের উদ্দেশ্যে যে কঠোর অনুশাসন দেখিতে পাই, হাফেজে তাহার ঠিক বিপরীত। সাদি নিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের প্রত্যেক পাপটি ধরিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার 'গোলেস্তান ও বুস্তান' রাজার পক্ষে রাজনীতি, যাজকের পক্ষে ধর্মনীতি, বিচারকের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র, যোগীর পক্ষে যোগতন্ত্র, আর সংসারীর পক্ষে পারিবারিক হিতোপদেশ। হাফেজও অধার্মিক নহেন কিন্তু হাফেজের ধর্ম অন্যরকম। সাদি চাহিতেন নিয়মের ভিতর থাকিয়া যার যার কর্তব্যের শৃঙ্খল অক্ষুণ্ন রাখিয়া ধ্যান ও ধারণার দ্বারা খোদাকে প্রাণের ভিতর উদ্বুদ্ধ করিতে; আর হাফেজ চাহেন সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া, মানুষ-কল্পিত সকল কর্তব্য বলিদান দিয়া অনুভূতির দ্বারা, আবেগের দ্বারা, সেই প্রেমময়কে প্রেয়সীর মতো আলিঙ্গন করিতে। হাফেজের জগতে মানুষের

প্রচলিত অনুশাসনের কোনো মূল্য নাই। তিনি সাদির ন্যায় প্রাণকে সর্বপ্রকারে সংযত সংহত করিয়া একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন না। তিনি চাহেন অবাধ সম্ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি—ধরিত্রীর বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে, রূপের লালিত্যে, গানের ঝঙ্কারে, যেখানে যেটুকু ঐশী সৌন্দর্য ফুটিয়া আছে, সেইখানেই প্রাণকে প্রসারিত করিয়া দিয়া সবটুকু সুধা শুষিয়া লইতে, লুঠিয়া লইতে। তাঁহার ক্ষুদ্র সাজিটি তিনি সারা বাগান জুড়িয়া ধরিয়াছেন, যেখানে যে-ফুলটি পড়িবে যেন তাঁহার প্রাণের সাজি এড়াইয়া পড়িতে না পারে। Rationalism-এর পর Sensationalism ও Mysticism-এর এইরূপ অভিব্যক্তি মানবসমাজে চিরন্তন, সকল যুগেই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। কঠোর সংযমের পর উদ্দাম ভাব-বিলাসের এই লীলাভিনয় যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন পারস্য-সাহিত্যের আর একবার দিক্‌পরিবর্তন ঘটিল। তটাহত তরঙ্গের ন্যায় উহার গতি আবার অন্যপথে প্রভাবিত হইল। মহাকবি জামীতে গিয়া এই ধারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জামীর শেষ বয়সের সাহিত্যে সকলরকম রসচাঞ্চল্য যত্নসহকারে বর্জিত হইয়াছে। মহাকবি রুমীতে কিন্তু এই উভয় ধারার একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। রুমীতে সাদির সংযম ও হাফেজের ভাবাবেশ উভয়ই সন্নিবিষ্ট, কিন্তু ভাব এখানে সংযমের দ্বারা শাসিত হইয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

গীতিকবিতা—পারস্য-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশ গীতিকবিতা। ইউরোপের গীতিকবিতা হইতে পারস্য গীতিকবিতার বিশেষ পার্থক্য এই যে, ইহা একাধারে গীতি এবং কবিতা। পারস্যের গৌরবের দিনে এ সকল গজল 'বরবত' নামক বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সভাস্থলে গীত হইত। বঙ্গদেশে এই জাতীয় গজল হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নিকট সুপরিচিত। সময় সময় কবি এবং সাধকগণ এই সকল গজল গাহিয়া বা অন্যের দ্বারা গান করাইয়া উচ্ছ্বসিত ভগবৎ-প্রেমের মাদকতাময় অপূর্ব তরঙ্গ উপভোগ করিতেন। যেদিন চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া যাইত, দখিন হাওয়ার বিবশ পরশে প্রাণ আবেশে ঢুলুঢুলু করিত, সেইসকল রজনীতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা উদ্যান-বাটিকায় উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিকদিগের সভা বসিত। আর চন্দ্র যখন পশ্চিমাকাশের কৃষ্ণ নিবিড়তার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িত, তখন পর্যন্ত তাঁহাদের সেই 'গোলাবের ইতিহাস', 'বুলবুলের প্রণয়কথা', 'সুরার মহিমা' ও 'প্রেমের মাধুরী' গীতাকারে চলিতে থাকিত। পারস্য-কাব্যের সাধারণ মূর্তি প্রায় সর্বত্রই একরূপ। খোদাতালার মহিমা বর্ণন, হজরত মোহাম্মদের (স.) প্রশংসা, আশ্রয়দাতার (Patron) গুণকীর্তন, স্বদেশের মাহাত্ম্যবর্ধন ও সেইসঙ্গে স্ব স্ব আত্মপ্রশংসা এই সকলের ধারাবাহিক অবতারণা প্রত্যেক কাব্যেরই প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আশ্রয়দাতার অতিরিক্ত প্রশংসা করা প্রাচীন কবিদিগের একটি স্বাভাবিক ও জাতিগত অভ্যাস। আত্মপ্রশংসাও প্রাচ্যদিগের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত দোষ। ফের্দৌসী হইতে জামী এবং কালীদাস হইতে মাইকেল কেহই এ দোষ হইতে নির্মুক্ত নহেন। গীতিকবিতাগুলির আলোচ্য বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্য। প্রকৃতির বক্ষে উদ্ভাসিত যে-সৌন্দর্যের ধারা মনকে সংসারের কলুষরাশি হইতে অপসারিত করিয়া অনন্ত অনধিগম্যের দিকে প্রেরণা দেয়, নদীর কলনাদে ও পাখির কূজনে ঊষার সৌন্দর্যে ও চন্দ্রের কৌমুদীতে যে-মহিমা যে-কমনীয়তা স্ফুরিত হইতেছে, সেইসকল অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা কিরূপে বিধাতার উদ্দেশে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রেমরাশি নৈবেদ্য দেয়, পারস্য গীতিকবিতায় তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের কবিতা ইহার আদর্শ।

পারস্য গীতিকবিতায় যেমন লালিত্য কমনীয়তা ও নিরঙ্কুশ কল্পনার উদ্দাম লীলাভঙ্গি দৃষ্ট হয়, পারস্য গদ্যসাহিত্যেও আবার তেমনি বর্ণনার ওজস্বিতা ও অলঙ্কারের চরম বিচ্ছুরণ দৃষ্ট হয়। গদ্যগ্রন্থগুলি প্রায়ই ঐতিহাসিক ও জীবনী-সংক্রান্ত; ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থও গদ্যে নিতান্ত অল্প নহে। কোথাও বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের উত্তেজনাময় গৈরিক স্রাব, কোথাও শান্ত সন্ধ্যা ও নৈদাঘ উষার নিবিড় বর্ণনা, কোথাও তুষারস্নাত উত্তুঙ্গ পর্বতমালা ও ক্ষিপ্র-প্রবাহিনী তটিনীর তাণ্ডব নর্তন—পাঠককে যুগপৎ বিস্ময় ও তন্ময়তায় অভিভূত করিয়া তুলে। সুলতান বাবরের আত্মজীবনীতে যে-বর্ণনাভঙ্গি ও ওজস্বিতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তিনি সুলতান না হইলে হয়তো সাহিত্যিক বলিয়াই জগতে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় লেখক সুপ্রসিদ্ধ নেয়ামৎ খান আলীর গদ্যরচনায় একাধারে মেকলের ভাব-উচ্ছ্বাস ও ভল্টেয়ারের শ্লেষবাক্যের যে-অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের মোগল রাজপরিবার হইতেও পারস্য-সাহিত্যের মণিমন্দিরে সামান্য উপহার প্রেরিত হয় নাই। সম্রাট-তনয়া জেব্‌উন্নিসার নাম জগতের কোন্ সাহিত্যিকের নিকট অপরিচিত!

কিন্তু অধুনা ভারতে পারস্য-সাহিত্যের চর্চা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ইহাতে অনেক পারস্য সাহিত্যিকেরই কীর্তিরাশি ক্রমে জনসাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইবে সত্য, কিন্তু তথাপি শেখ সাদি, হাফেজ বা ওমর খাইয়ামের স্মৃতি কখনো এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। শুধু ভারতবর্ষ কেন? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও ইহাদের যে গৌরবরশ্মি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে পৃথিবীর লয় পর্যন্ত তাহাতে কোনো মলিনতা স্পর্শ করিতে পারিবে না। যতদিন ভাষা ও ভাবের ওপর মানবসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন এইসকল সাধক-সাহিত্যিকের প্রাণের আবেগ মানুষকে আকুল না করিয়া পারিবে না। এ সকল অবিনশ্বর নামের সহিত এমনই একটি মাদকতা, এমনই একটি মোহনীয় স্মৃতি জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, মুহূর্তে ইহারা যেন শান্তির দেশের বারতা আনিয়া আমাদিগকে তন্ময় করিয়া তুলে :

পারস্য-কাব্য-কাননের বসন্তের দিন আর এখন বিদ্যমান নাই; তথাপি সেই মৃত সাধকের পবিত্র অস্থিপুঞ্জ স্থানে স্থানে বিচ্ছুরিত রহিয়া সমগ্র পারস্যদেশটিকে যেন একটি শান্তস্নিগ্ধ তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছে। যে-দেশের স্তন্য পান করিয়া হাফেজ ও সাদির উন্মেষ হইয়াছিল, যে-দেশের বুল্‌বুল্ ও তুতীর কাকলিতে জামী ও রুমীর অমর বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল; যে-দেশের উদাস হাওয়া ও নিশার নীরবতা ওমর খাইয়ামের প্রাণে বিশ্বদ্রোহী অভিমান জাগাইয়া তুলিয়াছিল; অযুত সাধকের পদরজ বক্ষে ধরিয়া, লক্ষ পীরের জাগ্রত সমাধি উদরে পুষিয়া যে-দেশের গরিমা মহিমান্বিত হইয়াছে—তাহার প্রতি ধূলিকণাটি, প্রতি প্রস্তররেণুটি আমাদের হৃদয়ের সহস্র তরঙ্গাভিঘাত জাগাইয়া তুলে না কি?

কবি ফেদৌসী

১

"(Shahnama) a glorious monument of Eastern genius and learning which if ever it should be generally understood in its original language, will contest the merit of invention with Homer himself."

—Sir William Jones.

এখনকার যুগে যেমন ঘরে-ঘরে কবির জন্ম হয়, পূর্বে এমন ছিল না। শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া সুললিত বাক্য রচনা করিতে পারিলেই যে কবি হওয়া যায় না, এ-কথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। এখনকার যুগে যেমন মাসিকপত্রের বাহুল্য ও প্রেসের সুবিধা রহিয়াছে পূর্বকালের কবিদের পক্ষে এই দুইটি উপকরণ ছিল না। তাই সেকালে রামা-শ্যামার মতো লোকে কবিতা লিখিতে যাইত না। যাঁহারা লিখিতেন অর্থাৎ যাঁহাদের লিখিবার শক্তি ছিল তাঁহারাও যে যশের প্রত্যাশায় দিনরাত্রি বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন তাহা নহে। যথার্থ কবিতা কখনই চেষ্টাপ্রসূত নহে। কবির মন, কবির দেখিবার শক্তি, কবির চিন্তা সাধারণ লোক হইতে অনেক ভিন্ন। সাধারণ মানুষ যাহা দেখে, যাহা ভাবে; সেইগুলিই কবির চক্ষে নূতন করিয়া দেখা দেয়, কবির প্রাণে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাস্তব জগতে নিহিত সত্যগুলি কবির হৃদয়বীণায় নূতনভাবে ঝঙ্কার দেয়, সে ঝঙ্কারে কবি আত্মহারা হইয়া গাছের শ্যামপত্র, পর্বতের বিরাটরূপ, নদীর অবোধ ভাষা এই সকলে কী যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সকল লইয়াই কবির প্রথম লেখা প্রথম ঝঙ্কার বিকাশ লাভ করে। তারপর যখন দেখে, এই বাস্তবজগতের ভিতর আরো একটি সূক্ষ্মজগত প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে তখন তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। এই যে সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব, এইটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বোঝা, স্পষ্ট ধারণা হৃদয়ে অনুভব করা; এইটি কবির জীবনের চরম লক্ষ্য। কবি যখন সাধনার বলে এই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তখন সে প্রকৃত কবি। তখন তাহার বীণার ঝঙ্কার শুধু কানের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে না, পরন্তু মর্মের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তোলে। এই সময়ের যে-কাব্য তাহা অবিনশ্বর। তাহা যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া মানবের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমরা লিখিত-গ্রন্থে যে-কাব্য পাঠ করি তাহা কবির এই মানসরাজ্যের মহাকাব্যের ছায়া বা কঙ্কাল মাত্র। ভাষার মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়া এই কঙ্কালগুলিই কবির ভাবপ্রতিমার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। সে ভাব কী প্রকারের, তাহার গভীরতা কত, কিরূপে তাহার বিকাশ হইল, প্রকৃতির নীরব সঙ্কেতে কিরূপে কবির হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইল ও সৌন্দর্যদেবতার কোন্ অঙ্গুলিস্পর্শে কবির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই সকল জানিবার জন্য মানবের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ও তীব্র

আকাঙ্ক্ষা, কবি-লিখিত কাব্যে তাহার অনেকটা নিবারণ হয় এবং কবির জীবনে এইগুলিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পারস্যের তুসনগরে যে-কবির জন্ম হয় ইনি প্রাচীন যুগের একজন মহাকবি। প্রাচীন অর্থে বাল্মীকি, হোমারের মতো প্রাচীন না হইলেও আজ নয়শত বৎসর হইল তাঁহার বীণার ধ্বনি নীরবতা লাভ করিয়াছে। ইনিই শাহনামার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ফেরদৌসী।[১] ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবুল কাসেম। ইঁহার পিতা মোহাম্মদ ইসহাক এবনে শরফ শাহ তুসনগরের রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কবি যৌবনে এই উদ্যান-পার্শ্বস্থিত নদীতীরে বসিয়া কাব্য লিখিতেন। শান্তিময় জীবনের দিনগুলি সুখের হিল্লোলে বহিয়া যাইত। নদীর কলনাদ তাঁহার কানের কাছে অপূর্ব সঙ্গীত গাহিয়া যাইত। সৈকত-বিহারী সমীরণ তাঁহার আকুল নিশ্বাস বহিয়া দিগদিগন্তে ছুটিয়া যাইত। সায়ং সন্ধ্যায় কবি প্রকৃতির সে সৌন্দর্যের পীযূষধারা পান করিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রকৃতির সে সৌন্দর্য কী আমরা তাহা বুঝি না। আমরা বুঝি পারস্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত ও মরুভূমি আর দুই-একটি খেজুর গাছ ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাঝে মাঝে যে দুই-একটি সমতল ভূমি আছে তাহাও বঙ্গের ন্যায় এমন সুজলা সুফলা নহে; অথবা স্কটল্যান্ডের মতো হ্রদবহুল শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিকিরীটিনী নহে। থাকিবার মধ্যে আছে পারস্যের সেই চিরবিখ্যাত ফলফুলেভরা বাগানশ্রেণী, যবশীর্ষশোভিত প্রান্তর আর স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী। কিন্তু কবির প্রাণে সে-দৃশ্য কী মহাসৌন্দর্যের অবতারণা করিত তাহা কবিই জানিতেন। তাই আজ রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়ে—

হেলা খেলা সারাবেলা,
সকল খেলা আপন মনে।

কিন্তু দিন কাহারো সমান যায় না। কবির সুখের দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। তাঁহার পরিবার তুসের গভর্নরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইল। অত্যাচার ও অবিচারে কবি মর্মে-মর্মে বড় ব্যথিত হইলেন। দেশের লোক তাঁহার দুঃখ দেখিল না। যাহারা দেখিল তাহারা বুঝিল না। আবার যাহারা বুঝিল তাহারাও তাঁহার সমবেদনায় একটা করুণার কথা মুখে আনিল না। দুর্দিনে সকলের দশাই এমন হয়!

কবির গৃহে অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি পিতা ও পরিবারের দুঃখ মোচনে প্রতিশ্রুত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন? কাহার নিকট আপন মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিবেন? কে একজন পথের পথিক অজ্ঞাতনামা লোককে সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে? বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে কবি নগরে নগরে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সে পূর্বভাব নাই। তেমন আর তাঁহার বিহগ-ঝঙ্কার শুনিয়া প্রাণ নাচিয়া ওঠে না। তৃণের উপর শিশিরবিন্দু দেখিয়া তাঁহার কল্পনা বিশ্বস্রষ্টার রূপ চিন্তায় ব্যস্ত হয় না। এখন তিনি বেদনার চক্ষু লইয়া সকল দেখিতেছেন, বেদনার অন্তর লইয়া সকল বুঝিতেছেন। বেদনাসঞ্জাত সহানুভূতি লইয়া আজ তিনি সমাজের অবস্থা দর্শন করিতেছেন। বিশ্বমানবের দুঃখ আজ তাঁহার মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন, শুধু তিনিই জগতে দুঃখী নন, শুধু তাঁহার পরিবারই দুস্থ নহে; তেমন শত শত পরিবার দুঃখের খরস্রোতে মুহ্যমান তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অত্যাচার-উৎপীড়নে দরিদ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই তবুও তার কোনো প্রতিকার হইতেছে না। রোগে-তাপে জর্জরিত হইয়া দুঃখীর পরিবার উৎসন্ন যাইতেছে—

---

১. জন্ম ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১০২০।

চিকিৎসা নাই, আনুকূল্য নাই। মরণের স্রোত অবিরাম চলিয়াছে—তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা নাই! শত শত নিরাশ্রয় লোক ও প্রবাসী পান্থ অনাহারে-অনিদ্রায় কষ্ট পাইতেছে! অন্নবস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই, পান্থনিবাস নাই। বর্ষে বর্ষে নদীর বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া শত শত লোকের দুঃখের পথ মুক্ত করিতেছে, জীবজন্তু শস্যাদি বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দেশ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থলী হইতেছে; কেহই সেদিকে লক্ষ করিতেছে না। এই শোচনীয় দৃশ্য, দেশের এই আকুল আর্তনাদ তাঁহার হৃদয় শতধাবিদীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি একটি মহত্তর কর্তব্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিলেন—সংকল্প করিলেন, যেরূপেই হউক দেশের এই হাহাকার নিবারণ করিতেই হইবে।

অন্তর্যামী তাঁহার প্রাণের আকুলতা বুঝিলেন। তাঁহার সময় ফিরিল। এই সময় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট গজনী নগরে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি সুলতান মাহমুদ। তখন তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ও অসামান্য যশোরাশি ভারতের দ্বারদেশ হইতে সুদূর পারস্যের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। যিনি যে-দেশেরই হউন, যাঁহারই প্রতিভা আছে তাঁহার পক্ষে সুলতান মাহমুদের সভায় প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল! জনরবের ভিতর দিয়া প্রতিভার এই সাদর আহ্বানের একটি ঢেউ আবুল কাসেমের (ইনি এখনো ফেরদৌসী উপাধি পান নাই) হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি জগতের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের মহিমান্বিত সভাস্থলে স্বীয় মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে চলিলেন।

২

সায়ংকাল—মৃদু সমীরণ রহিয়া রহিয়া তরুলতা দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকালের লোহিত-রঞ্জিত মেঘমালার কিরণ-আভা পরিব্যাপ্ত হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছে। নিস্তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহে দূরাগত বিহগের ললিত কূজন বাহিত হইয়া ভাবুকের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; মুহূর্তের পর মুহূর্ত নূতন হইতে নূতনতর পুলকের ধারা বহিয়া আনিতেছে। এই সৌন্দর্যের মধ্যে এই সুখপ্রবাহে আত্মহারা হইয়া মাহমুদের সভার শ্রেষ্ঠ কবি আনসারী দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজ-উদ্যানে বিহার করিতেছেন। সঙ্গী দুইজনও কবি, কবির সহচর কবি; অপূর্ব মিলন। সকলেই আনন্দে ও আমোদে আত্মহারা।

এই আনন্দের সময় সহসা একটি বিঘ্ন জন্মিল। একজন দীনহীন মলিনবেশ পথিক আসিয়া সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল। কবি আনসারী অপ্রসন্ন হইলেন; সঙ্গীদ্বয় ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। একজন বলিলেন, লোকটাকে এই মুহূর্তে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। অন্যটি ইহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু আনসারী বলিলেন, কাহার ভিতর কী আছে, কে বলিতে পারে? হইতে পারে এই লোকটার ভিতর এমন কিছু আছে যাহাতে ইঁহাকে অপমানিত করিয়া পরে আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং লোকটাকে অপমানিত না করিয়া কৌশলে দূর করিয়া দেওয়া যাউক। পরিশেষে তাহাই ঠিক হইল। ইত্যবসরে পথিক তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। তখন আনসারী কহিলেন, বন্ধু! আমরা তিনজনেই রাজকবি; কবি ব্যতীত অন্য কাহারো সহবাস আমরা ভালোবাসি না। পথিক তখন বিনীতভাবে বলিলেন—মহাত্মন, এ দীন ব্যক্তিও একজন কবিতার উপাসক। আনসারীর বিস্ময় হইল, বলিলেন—বেশ, আমরা তিন বন্ধু তিনটা চরণ বলিব, আপনি যদি তাহার চতুর্থপাদ পূরণ করিতে পারেন তবে বুঝিব আপনি কবি। পথিক

জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। একে একে তিন রাজকবি তিনটা চরণ বলিলেন; কিন্তু তাহা এমনই কৌশলে রচিত যে, সেগুলির শেষ শব্দ শন্‌ভাগান্ত এবং পারস্য ভাষায় ঐ তিনটা ভিন্ন ঐ প্রকারের আর দ্বিতীয় শব্দ নাই। সুতরাং তাহার পাদপূরণ পারস্যের যে-কোনো কবির পক্ষে সুকঠিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পথিক কালবিলম্ব না করিয়াই চতুর্থপাদ এরূপ কৌশলে পূর্ণ করিলেন যে, কবিগণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পদ্যটা এইরূপ :

আনসারী : চুঁ আরেজে তু মাহ্ না বাসাদ রওশন্;
আছ্জাদী : মানান্দে রোখত্ গোল না বুয়াদ দর গোলশন্;
ফারুকী : মেজ্গানাত হামী গোজার কুনাদ্ আজ জওসন্;
পথিক : মানান্দ্ সেনানে 'গেঁও' দর জঙ্গে পুশন্।
(অনুবাদ)
আনসারী : চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ সম;
আছ্জাদী : বাগানে গোলাপ নাহি হেন মনোরম;
ফারুকী : তোমার চোখের ভুরু বর্ম ভেদ করে;
পথিক : বর্শা যথা 'গেঁও' করে পুশন্ সমরে।[১]

বলাবাহুল্য এই পথিকই আমাদের আবুল কাসেম (ফেদৌসী)। পথিকের এই অলৌকিক প্রতিভায় আনসারী বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ও এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন সকলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কাব্যামোদে সুখের সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কিন্তু এই সুখের ভিতর আনসারীর হৃদয়ে একটু বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই কবির অলোকসামান্য প্রতিভা মাহমুদের গোচরে আসিলে এতকাল ধরিয়া তিনি-যে অবিসংবাদিত যশ উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা অচিরে রাহুগ্রস্ত হইবে। তাই তিনি বন্ধুদ্বয়সহ বহ্নিমান হিংসা হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া হাসিমুখে আবুল কাসেমের নিকট বিদায় লইলেন। সত্যই আজ তাঁহার যশঃরবি মাধ্যাহ্নিক রেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িল। আনসারীর মুখে আবুল কাসেম রাজসভা বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিয়া লইলেন। অতঃপর কিরূপে তিনি সুলতান মাহ্মুদের মহিমান্বিত দরবারে প্রবেশলাভ করিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন।

গজনীর পান্থশালায় দরিদ্র কবির বাস। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু রাজসভায় প্রবেশের কোনো উপায়ই হইতেছে না। নগরের সে আনন্দ-কোলাহলময় জনসঙ্ঘের মধ্যে একজন লোকও কবির আপনার নয়। সে বিশাল জনসমুদ্রে কবি যেন নিজেকে হারাইয়া বসিয়াছে। শত শত লোক সে পান্থনিবাসে আসিতেছে-যাইতেছে, কিন্তু কেহই তো কবির প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহে না। দারিদ্র্যের মলিনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকায় যে-জ্বলন্ত প্রতিভা কবির হৃদয়ের ভিতর ধূমায়মান হইতেছিল বাহিরের লোক তাহা দেখিতে পাইল না। সেদিন কি কবি মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, ভবিতব্য তাঁহার জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে একটি গৌরবময় আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন!

কিন্তু অগ্নি বেশিদিন প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। একদিন হঠাৎ বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের ধূমরাশির সংযোগ হইল। উজির মোহেক বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার

---

[১] গেঁও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধার নাম। পুশন্ একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

পরিচয় হইল। তার পরই তাঁহার বহ্নিমান প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণে চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মোহেক কবির প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে নিজগৃহে আশ্রয়দান করিলেন। পান্থনিবাসের অনাদরে পতিত রত্নটি আজ রাজমন্ত্রীর কণ্ঠে আশ্রয় পাইল। রাজমন্ত্রী দীর্ঘদিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে যখন বাটী ফিরেন, কবি নিত্য ললিত-ঝঙ্কারে তাঁহার অবসন্ন প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করেন। সারা সন্ধ্যা এমনি করিয়া সুখের সম্মিলনে কাটিয়া যায়।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু মোহেক রাজমন্ত্রী, সারাদিন আপনার কাজে ব্যস্ত; কবির উদ্দেশ্য কী, আকাঙ্ক্ষা কী, তাঁহার প্রাণে যে কী বেদনা, তিনি তাহা লক্ষ করেন না। কবি একান্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

হৃদয়ে দারুণ উৎকণ্ঠা; কবির দিন আর যায় না। তারপর হঠাৎ একদিন সুযোগ মিলিল। কথায় কথায় একদিন মোহেক তাঁহাকে আনসারীর কাব্যরচনার বর্ণনা দিলেন এবং তাঁহার রচিত একখানি কাব্য আমাদের কবিকে উপহার দিলেন। কাব্যখানি সোহরাব ও রোস্তমের যুদ্ধ সংক্রান্ত। কবি তাহা পড়িলেন; পড়িয়া মাহমুদের সভার শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে তাঁহার যে-ধারণা হইল তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পরদিন তিনি এই উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নিজে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া মোহেক সাহেবকে উপহার দিলেন। কাব্যের বিষয় ঐতিহাসিক—রোস্তম ও ইস্পিন্দিয়ারের যুদ্ধ। মোহেক এই কাব্যপাঠে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি পরদিন উহা রাজসভায় উপস্থিত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাহ্মুদের রত্নসভায় এ কাব্যের অনাদর হইল না। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, কাব্যজগতে এটির স্থান অতি উচ্চ, সম্ভবত সর্বোচ্চ। শুধু এই নয়, এমন কাব্যের যিনি রচয়িতা, যাঁহার লেখনী কল্পনার এমন বৈচিত্র্য ও ভাষার এমন ওজস্বিতার মধ্যেও ভাবের এমন বেগবতী মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, যাঁহার লেখার মাধুর্য শুধু কর্ণে মিলাইয়া যায় না, পরন্তু কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করিতে পারে—এমন করিয়া মনকে অন্তত মুহূর্তের জন্য জীবনের কোলাহলময় অশান্তি হইতে ভুলাইয়া কল্পনার এক রমণীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্মা মহাকবির প্রতি গুণগ্রাহী মাহ্মুদ স্বীয় আন্তরিক সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন।

পথের কাঙাল কবি সম্রাটের সভায় নিমন্ত্রিত। তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কবি ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—কী কারুকার্য, কী সৌন্দর্য, কী বৈভব সে রাজসভায় মূর্তিমান হইয়া বিরাজিত। সে মহিমান্বিত সভায় কবির চক্ষু ঝলসিয়া গেল। চারিদিকে চাহিলেন। নীতিবিৎ, সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক—তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি সে-সভায় সমবেত। কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্রমে তিনি মাহ্মুদের সমীপে নীত হইলেন। কিন্তু পরিচয় হইল সেই চিরপ্রচলিত প্রাচীন রীতি অনুসারে, অর্থাৎ কবিতায়। উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া কবি সভাস্থলে সুলতানের সংবর্ধনা করিলেন। তন্মধ্যে একটি ছত্র এই :

চুঁ কাওদক আয শিরে মাদর্ বেসাস্ত্,
ব-গাহওয়ারা মাহ্মুদ গোইয়াদ্ নাখাস্ত্

—শিশু মাতৃস্তন্যে রসনা সিঞ্চিত করিয়া, প্রথম যে-শব্দটি উচ্চারণ করে তাহা মাহ্মুদ। রাজসভা নীরব—নিস্তব্ধ; সকলের বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন এই নব্যকবির উপর আকৃষ্ট।

সভায় সপ্তকবি বিস্ময়-বিমূঢ়-চিত্তে নব্যকবির করচুম্বন করিলেন। প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। মাহ্‌মুদ তখন মুগ্ধপ্রাণে এই বলিয়া সেই অলোক-সাধারণ শক্তির অর্চনা করিলেন :

আয় ফেদৌসী, তু দরবারে মা'রা ফের্‌দৌস্ কর্‌দী।

—ফেদৌসী, তুমি সত্যই আমার সভাস্থল স্বর্গে পরিণত করিয়াছ।

এই হইতে কবির নাম 'ফেদৌসী' হইল। একাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আজ সুলতান মাহ্‌মুদের সভা অলঙ্কৃত করিলেন।

৩

নিরাশ্রয় অজ্ঞাতনামা কবি কিরূপে অসামান্য প্রতিভার বলে সুলতান মাহ্‌মুদের রাজসভায় প্রবেশলাভ করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। শুধু প্রবেশলাভ নয়, একেবারে রাজকবি! অধিকন্তু সুলতান স্বীয় প্রাসাদের নিকট কবির জন্য এক গৃহ নির্দেশ করিলেন। সায়ংসন্ধ্যায় সুলতান তাঁহার সহিত কাব্যালোচনা করিতেন। সেকালের প্রচলিত প্রকাশ্য রাজসভার কল্যাণে এরূপে হঠাৎ বড়লোক হইবার সুযোগ নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। হায় সে কাল!

ফেদৌসীকে বুঝিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গুণগ্রাহী সুলতান মাহ্‌মুদকেও বুঝা দরকার। রণপণ্ডিত ও বিজয়পিপাসু হইলেও কেবল রণপয়োধির লহরি গণিয়াই যে তাঁহার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন পর্যবসিত হয় নাই, তাহা ঐতিহাসিক পাঠকের অবিদিত নাই। যে দুরাধর্ষ মূর্তিতে মাহ্‌মুদ সোমনাথ হইতে সুদূর বাগদাদের দ্বারদেশ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া তাঁহার আরও একটি মূর্তি আছে; সে মূর্তি অতীব মধুর ও কমনীয়। সমরক্ষেত্রে যেমন গভীর তুর্যনিনাদ তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত; শান্তির সময়ে তেমনি কাব্য, ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চায় তাঁহার প্রাণে অপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস খেলিয়া যাইত। প্রাচ্যজগতের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া তিনি রাজধানী গজনী নগরীকে এক অপূর্ব শ্রী প্রদান করেন। তৎকালে গজনীকে দেখিলে মনে হইত যেন বিধির রত্নরাজি বিভূষিত এক বিরাট উৎসব-মন্দির—মহাকবি ফেদৌসী তার অভিনেতা আর স্বয়ং সুলতান মাহ্‌মুদ তার অনুষ্ঠাতা। প্রাচীন পারস্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন মাহ্‌মুদের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য। ফেদৌসীর আগমনে আজ তাঁহার সেই কার্যে মনের মানুষ মিলিল।

অতি প্রাচীন যুগ হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, পারস্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লইয়া কবি-কল্পনার বিলোল চিত্রপটে, আর্টের তুলিকা প্রভাবে ফেদৌসী কাব্যাকারে যে অপূর্ব চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাই জগতের সম্মুখে শাহ্‌নামা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহাই পারস্যবাসীদের জাতীয় কাব্য, ইহাই তাহাদের একান্ত আদরের 'মহাভারত'।

৪

মানুষ আপনার দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা লইয়া গর্ব করে। কিন্তু যে অজ্ঞাত মহীয়সী শক্তি অন্তরালে রহিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যে-শক্তির প্রভাবে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত থাকিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, মানুষ তাহার

কোনো সংবাদ জানে না। বিশ্বে যে অবিরাম কর্মস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, মানুষ অন্ধ কীটের ন্যায় সেই স্রোতে গা ঢাকিয়া দিয়া নিয়তির পানে ছুটিয়াছে—জানে না কোন্ ঘটনা কোন্ অজ্ঞাত সংযোগের ভিতর দিয়া তাহাকে কোন্ পথে টানিয়া লইতেছে। ফের্দৌসী মনে করিতেছেন, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সিঞ্চিত করিয়া যে মহামহীরুহের তিনি প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন কালে হয়তো তার সুশীতল ছায়ায় তাঁহার তৃষিত তাপিত হৃদয়টি একটু শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু তিনি জানিতেন না, তদীয় শত্রু প্রধান উজিরের হৃদয়ে যে-বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেছিল তাহাই একদিন ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সাধের আশা-তরুটিকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে।

প্রধান উজির খাজা ময়মন্দী নিজকে যত বড় মনে করিতেন, সভাস্থ স্বার্থসেবী পরিষদের দল অযথা স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে আরো বড় করিয়া তুলিয়াছিল। অপরের নিকট স্তুতিলাভ তাঁহার যেন একটি ন্যায্য পাওনায় পরিণত হইয়াছিল। তাই যখন ফের্দৌসী তাঁহার বিনা সহায়তায় রাজসকাশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন ও তাঁহার তুষ্টি সাধনের কোনো উদ্যমই প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বাজিয়া গেল। বস্তুত ফের্দৌসী সাধারণের স্তুতিপাঠ করিতে রাজসভায় আসেন নাই। অযথা একজনের তোষামোদ করিবেন ফের্দৌসী সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের বলও তোমার আমার মতো নয়। জগতে যাঁহারা অতিমানুষ-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এইখানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব। ফের্দৌসীর সহিত উজিরের মনের আর মিল হইল না। অমিল ক্রমে পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় পরিণত হইল। ইহার উপর দুইজন ধর্ম হিসাবেও শিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এই ঘৃণার ভাবটা ক্রমেই জাঁকালো হইয়া উঠিতেছিল।

সময়ের পরিবর্তন ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ভাব ও উৎসাহেরও অনেক পরিবর্তন হয়। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শাহ্‌নামা রচিত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে মাহ্‌মুদের রুচিরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। অধিকন্তু কাব্যের একটি বিষয় মাহ্‌মুদের প্রাণে বড় বাজিয়াছিল—সেটা আভিজাত্যের ছড়াছড়ি। মাহ্‌মুদ নিজে ক্রীতদাসের সন্তান ছিলেন, কবির প্রিয়বন্ধু কবিকে এ-বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতে পারেন নাই। কেননা, সুলতানের মন জোগাইতে গেলে তাঁহার মানসপুত্রটির অঙ্গহানি করা হয়। যে-কাব্য শতাব্দীর পর শতাব্দী পারস্যের জনসাধারণ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে, তার সম্পাদনে তিনি তো এক মাহ্‌মুদের ভয়ে স্বীয় কবিপ্রতিভায় অঙ্কুশ বসাইতে পারেন না! ফের্দৌসী যে জাতীয় কবি! "He was not for one age, but for ages to come." ফলে কাব্য শেষ হইলে উহা দেখিতে মাহ্‌মুদ পূর্বের ন্যায় আরো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। এইখানে কবির ভাবী অদৃষ্টের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। উজির ময়মন্দী তাহাতে উপলক্ষ স্বরূপ হইলেন। বোধহয় ময়মন্দীর চক্রান্ত না হইলে মাহ্‌মুদকে আজ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট বলিয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে হইত না![১]

কবি স্নানাগার হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় তাঁহার কার্যের পুরস্কার তথায় পৌঁছিল। উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সাগ্রহে পুরস্কারের দিকে দৃষ্টি করিলেন, কিন্তু এ কী! এ তো ষষ্টীসহস্র শ্লোকের প্রতিশ্রুত ষষ্টীসহস্র স্বর্ণমুদ্রা নয়; এ যে রৌপ্যমুদ্রা! ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে মুহূর্তের জন্য কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তারপর সহসা তাঁহার প্রাণের সমুদয় সুপ্তশক্তি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। গভীর অবজ্ঞার সহিত তিনি সেই

---

[১] এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই—সুলতান মাহ্‌মুদ কবিকে তাঁহার রচিত প্রতি শ্লোকের জন্য একটা করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

ষষ্টীসহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শুধু প্রত্যাখ্যান নয়—মুদ্রাবাহক ভৃত্যগণ, স্নানাগারের রক্ষক ও পার্শ্ববর্তী এক মদ্যবিক্রেতার মধ্যে সেই সমুদয় অর্থ ভাগ করিয়া দিলেন! জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের এই পুরস্কার—জীবনের সকল আশা, সকল শক্তির এই শেষ ফল অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জন করিয়া তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একটি বিরাট মহাজাতির জাতীয় কবির যে উচ্চ আসন, আত্মমর্যাদায় ফের্দৌসী তাঁহার সেই গৌরবময় আসন অক্ষুণ্ন রাখিলেন।

ফের্দৌসী দরিদ্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় দরিদ্র ছিল না। কবিপ্রতিভার অর্ঘ্যস্বরূপ সুলতান রৌপ্যমুদ্রা দিতেছেন, আর এই অপমান সহ্য করিয়া টাকার প্রলোভনে তিনি আজ সম্রাটের এই দান গ্রহণ করিবেন, ফের্দৌসীর প্রাণ তো এত হীন নয়। এ হীনতা স্বীকার অন্যে হয়তো করিতে পারিত, কিন্তু ফের্দৌসী তাহা পারেন না। ফের্দৌসীর জীবনে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, যদি কিছু প্রণম্য থাকে তবে তাহা এইখানে। এইখানে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা খাঁটি ছবিটি সাড়া দিয়ে উঠিয়াছে। এইরূপ করিয়াই তো মহাপুরুষেরা স্ব স্ব জীবনের ভিতর দিয়া সত্যকে ফুটাইয়া তুলেন—এমনি করিয়াই তাঁহারা ত্যাগের ভিতর দিয়া, বিসর্জনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। তুমি আমি তো রোজ দুবেলা মুখে-মুখে কত সত্য আওড়াইতেছি, কিন্তু আমরা সত্যকে হৃদয়ে অনুভব করি না। আর মহাপুরুষেরা উহা হৃদয়ে অনুভব করেন, অনুভব করিয়া কার্যের ভিতর দিয়া তাকে ফুটাইয়া তুলেন। তাই তোমাকে আমাকে ফেলিয়া জগৎ মহাপুরুষের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

৫

জিনিসটা যেমন—তা, সে ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমরা যদি ঠিক তেমনি করিয়া তাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে বোধহয় কোনো অশান্তিই থাকিত না; তানলয় সংযুক্ত একটি সঙ্গীতের ন্যায় এই পৃথিবীটা সুষমার ষোলোকলায় পূর্ণ হইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। জগতের যত অসামঞ্জস্য, যত অশান্তি, যত বিপ্লব সমস্তই এই বুঝিবার ভুল হইতে। সে ভুল কোথাও স্বকৃত, কোথাও পরকৃত, কোথাও সজ্ঞানে, কোথাও অজ্ঞানে। ফের্দৌসী যাহা করিলেন, তাহা যদি সুলতান স্বচক্ষে দেখিতেন তবে তার ফল কী হইত জানি না। কিন্তু অপরে তাঁহাকে যেভাবে উহা বুঝাইয়াছিল, তাহার ফল অতি বিষময় হইয়াছিল। এই অপর অন্য কেহ নয়, স্বয়ং উজির ময়মন্দী। যখন শুনা গেল, ফের্দৌসীকে হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত করা হইবে—সুলতানের এই আদেশ, তখন ফের্দৌসীর প্রাণ কাঁপিল। মরণের কী যাতনা, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, মরণের সে যবনিকার অন্তরালে কী আছে, এ চিন্তায় প্রাণ কাঁপিবে? ফের্দৌসীর তো তেমন প্রাণ নয়! ফের্দৌসীর প্রাণ কাঁপিয়াছিল—দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে! দুঃখ কেন? কিসের দুঃখে? মরিবে বলিয়া? মরিতে দুঃখ হয় বৈ কী! এই সুন্দর ধরা এমনি করিয়া হাসিবে, এই ফুল চিরদিনই ফুটিবে! এ নদী এমনি করিয়াই চিরতরঙ্গী হইয়া বহিয়া চলিবে; বন্ধুবান্ধব যে যাহার কাজে এমনি করিয়া ডুবিয়া থাকিবে। শুধু সে অতীতের কোন্ অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবে! শ্মশানঘাটের কয়লাটুকুর মতো দুই-চারিদিন তাহাদের স্মৃতিপটে লাগিয়া থাকিয়া কোথায় কোন্ স্রোতবেগে অনন্তের তরে মুছিয়া যাইবে, কেহই আর সেই পুরাতন স্মৃতিটার প্রতি ফিরিয়া তাকাইবে না! এ কী দুঃখ নয়! দার্শনিক যদি বলে মরণ কিছু নয়, কেবল বাহিরের আকারে একটু পরিবর্তন, তাই মরণে তার দুঃখ আসে না; আমরা বলি সে-যে তাহার মনটাকে বুঝিতে ভুল করে নাই, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

কিন্তু ফের্দৌসীর এজন্য দুঃখ হউক আর নাই হউক, তাঁহার দুঃখের অন্য কারণ ছিল। তাঁহার দুঃখ, জগৎ তাঁহাকে বুঝিল না। মাহ্‌মুদ ত্রিশ বৎসর তাঁহার সহবাস করিয়াছেন, তিনি তো জানেন ফের্দৌসীর প্রাণের তেজ কত। কিন্তু জানিলে কী হয়—রাজশোণিত তো মাহ্‌মুদের ধমনীতে প্রবাহিত নয়! আত্মমর্যাদার তিনি কী বুঝিবেন। ফের্দৌসী মরিবে, সে তো তাহাতে কাতর নয়! কিন্তু 'অপরাধীর মরণ' তো তাহার বাঞ্ছনীয় নয়। নিরপরাধের মরণ একবার, কিন্তু অপরাধীর মরণ চিরকাল। চিরকাল জগৎ তাহার বিচারাসনে বসিবে ও ইতিহাসের মিথ্যা সাক্ষ্য লইয়া চিরকাল তাহার উপর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিবে। যখন ফের্দৌসীর ত্যক্ত অস্থিমালায় ভাবী মানব কলঙ্কের অনপনেয় রেখা খুঁজিয়া বাহির করিবে তখন তাঁহার আত্মা যে অন্তরীক্ষে আপনাআপনি পরিম্লান হইয়া পড়িবে। সুতরাং এমন মরণ ফের্দৌসীর চলিবে না। সুলতানের সহিত তিনি নির্জনে সাক্ষাৎ করিবেন। সাক্ষাতে ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিয়া তাঁহার কলঙ্ক মোচন করিতেই হইবে। তারপর যদি সম্ভব হয় সুলতানের নিকট জীবনভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

কবি জীবন দান পাইল। কিন্তু এ লাঞ্ছিত ব্যর্থ জীবনে আর তাঁহার কী প্রয়োজন? সুদূর অতীতের কথা মনে পড়িল। যৌবনের সেই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের প্রফুল্লতা, জগতের প্রত্যেক বায়ুর কম্পনে জলের কল্লোলে সৌন্দর্যের অনুভূতি, আর সেই বিকাশ-উন্মুখ কবিত্বের প্রথম উচ্ছ্বাসময়ী ছটা—একে একে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। রজনী যতই গভীর হইতে লাগিল ততই সকল চিন্তা তাঁহার বিষাদখিন্ন প্রাণটাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে মহৎ সঙ্কল্প ও উচ্চ আশা লইয়া তিনি গজনীতে আসেন তাহাও সিদ্ধ হইল না। অত্যাচার-পীড়িত জীবনে একবিন্দু শান্তি লাভ—রাজধানীর বিপ্লব ও কুচক্রময় কোলাহলে তাহা ঘটিল না। রাজপ্রদত্ত অর্থে দেশবাসীর দুঃখের অশ্রুও মুছানো চলিল না। রাজধানী হইতে সুদূর তাঁহার স্বদেশে যে-অত্যাচারের স্রোত চলিয়াছে, দেশবাসীর যে-কষ্টের হাহাকার তাঁহার মর্মের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, ফের্দৌসীর দ্বারা তাহার কোনোই প্রতিকার হইল না।

রজনী গভীরা; মহানগরী নীরব! অসংখ্য দীপরাজি নিবিড় নৈশ অন্ধকারের সহিত নীরবে যুঝিতেছে; যুঝিয়া যুঝিয়া ক্রমে ক্লান্ত ও মলিন হইয়া পড়িতেছে! মহাভোজের অবসানে নীরব উৎসব-মন্দিরের ন্যায় গজনী স্তব্ধ। এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রভাতের পাখি যখন ডাকিবে তখন কবিকে গজনীর সহিত চিরদিনের মতো সকল সম্বন্ধ ছেদন করিতে হইবে। ইহাই সুলতানের আদেশ—জীবন-দণ্ডের পরিবর্তে নির্বাসন। এই ত্রিশ বৎসরে গজনীর মানসমূর্তি তাঁহার প্রাণটা যেন জুড়িয়া বসিয়াছিল। গজনীর প্রতি পাপিয়া, প্রতি দোয়েলটার উপর তাঁহার একটি মমতা জন্মিয়াছিল। পথের তরুটাও যেন তাঁহার চিন্তায় একটু অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল! ঐ যে গজনীর আকাশে নীরব তারকারাজি ফুটিতেছে, হাসিতেছে, আবার যেন কাঁদিয়া নীরব নীলিমায় মিশিয়া যাইতেছে। ঐগুলি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার কত নিদ্রাহীন রজনী কাটিয়া গিয়াছে। কতদিন তারা অদৃশ্য 'অঙ্গুলি পরশনে' তাঁহার হৃদয়ের স্ফুটনোন্মুখ ভাবগুলিকে কবিতার আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেগুলি এমনি করিয়াই গজনীর উপর চিরদিন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবে। কিন্তু ফের্দৌসীর কবিপ্রতিভা আর সে ইন্দ্রজালে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে না। সুদিনে কত বন্ধু, কত সখা এবং গজনীর বিলাসভূমিতে গজাইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা কি কখনো তাঁহার জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে? মহাকবির স্মৃতি কি একদিনও গজনীর জনসঙ্কুল রাজপথে কাঁদিয়া ফিরিবে না? এইরূপে অবিশ্রান্ত চিন্তাস্রোতে কবির হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল।

সব ফুরাইল! যাঁহার গুণগ্রাহিতার স্নিগ্ধ কিরণে লুব্ধ ভোমরার ন্যায় জীবনের মধ্যাহ্নে কবি ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্মম আদেশে, জীবনসন্ধ্যার প্রাক্কালে সে আজ শূন্য হৃদয়ে ভগ্নপ্রাণে বিদায় লইতেছে। সকল শক্তি, সকল উৎসাহ ব্যয়িত করিয়া জীবনের মধ্যাহ্নে যাঁহার উৎসবে সে কাটাইয়া দিয়াছে, তাঁহারই দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া, জীর্ণ-তরণীর ন্যায় সে আজ দিকহীন লক্ষ্যহীনভাবে আকুল সংসার-সাগরে ভাসিয়া চলিল। যাঁহার জন্য এত হইল, কবি কি তাঁহাকে দুটা মুখের কথাও বলিবে না? এত অপমান, এত লাঞ্ছনা কবি নীরবে সহিয়া, নীরবে বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবে? না।

কবি লেখনী ধারণ করিলেন। অগ্নিগর্ভ-পর্বতের ভীষণ গৈরিক স্রাবের ন্যায় জ্বালাময় হৃদয়ের যে তীব্র গঞ্জনা তাঁহার লেখনীর মুখে নির্গত হইয়াছিল, ব্যথিতের মর্মস্পর্শী বাণীরূপে তাহা ভাষার মর্মপটে আজিও পরিস্ফুট রহিয়াছে। একসময় কবির সে গঞ্জনাগীতি প্রবাদের ন্যায় লোকমুখে শ্রুত হইত। হৃদয়ের যাতনায় অভিমানী কবি আজ যাহা করিলেন; পাঠক, তুমি তাহা মন্দ বলিও না। সারাজীবনটাকে বলিদান করিয়া যিনি জগতের জন্য শাহ্‌নামার ন্যায় অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, উচ্ছ্বাসে ইংরাজ-লেখক যাঁহাকে হোমারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহার সেই নিষ্পেষিত মর্মাহত হৃদয়ের ব্যথা স্মরণ করিয়া তোমার ঐ বেদনাকাতর চক্ষুতে কি দুই ফোঁটা অশ্রু ভাসিবে না?

লেখা শেষ করিয়া কবি তাহা প্রিয়সুহৃদ 'আয়েজের' নিকট প্রদান করিলেন। অভিপ্রায়, —কবির প্রস্থানের পর সুলতানের হস্তে উহা প্রদান করা। পরদিন প্রভাতে গজনীতে সেই তেজঃপুঞ্জ কবিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

৬

আফগানিস্তানের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজপথ পারস্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। পথ সর্বত্র বন্ধুর কঙ্করময়—কোথাও উচ্চ গিরিরাজির ভিতর দিয়া, কোথাও দৃষ্টিপথাবরোধী বিপুল আয়তন অরণ্যশ্রেণী ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্বে দূর-প্রসারিত শস্পাস্তীর্ণ হরিৎ ভূমি, অথবা যবশীর্ষশোভিত দীর্ঘ উপত্যকা। কোথাও তরঙ্গভঙ্গময়ী মরুভূমির অগ্নিকণোদ্ভাসিত করালমূর্তি, কোথাও-বা প্রসন্ন চিবিক্ষোভশালী হ্রদরাজির কোকনদ-খচিত নীল উদার বক্ষ। নির্মেঘ আকাশের বহ্নিমান সূর্য কোথাও রোষ-রশ্মি-সংঘাতে প্রচণ্ড প্রতাপে মরুবক্ষ ভস্মীভূত করিতেছে; আবার অন্যত্র সেই সূর্যই যেন দূর বনান্তরালে কোন্ শমীবৃক্ষে অস্ত্রপুঞ্জ ন্যস্ত রাখিয়া মদালস নয়নে পর্বতাশ্রিত তুষারমালার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। ঘূর্ণিরূপে মহাবাত্যা কখনো মরুবক্ষ মর্দিত করিতেছে; আবার বনানীর স্নিগ্ধ ছায়াঞ্চলতলে আসিয়া শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেছে। প্রভাতসূর্যের প্রেমোষ্ণ করস্পর্শে লজ্জাশীলা কুজ্ঝটিকা পর্বতগুহায় আত্মগোপন করিতেছে। প্রস্ফুটিত কমলিনী আপনার স্বচ্ছ সুন্দর সরসী মন্দিরে হাসিমুখে বসিয়া সূর্যের প্রতীক্ষা করিতেছে! অনন্তকাল এরা জীবন পরম্পরার ভিতর দিয়া মহাপূর্ণতার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। কখনো জীবনের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া, কখনো মৃত্যুর ছায়াময় অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়া আপনার পথ কাটিয়া চলিয়াছে। জাগিয়া জাগিয়া শুকাইয়া শুকাইয়া কতবার সমাধি লাভ করিয়াছে। আবার সমাধির পাশে নূতন দেহ, নূতন আশা লইয়া নবজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। অনন্ত এ জীবনযাত্রা। মহামিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ আজিও সমাগত হয় নাই। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এ লীলা প্রকৃতির নগ্ন বুকে বিরাজমান রহিয়াছে।

কিন্তু এ দৃশ্য, এ লীলাভিনয় কাহার জন্য? কে তার আপনার চিত্তার্পিত সুখদুঃখের গুরুভার সরাইয়া দিয়া প্রকৃতির এ লীলাভিনয়ে প্রাণের তাপ মিশাইয়া দিবে? ঐযে পরিশ্রান্ত অশ্বারোহী এই সঙ্কেতময় জীবন্ত ছবি দলিত করিয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে, তাহার কাছে এ চিত্রের কোনো অর্থ আছে কি? প্রাণভয়ে যে দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে কবি হউক, দার্শনিক হউক বা সাহিত্যিক হউক, তাহার নিকট জগতের নীরব নির্বাক প্রাকৃতিক লীলাতরঙ্গ সৌন্দর্য-বিকাশ অর্থহীন, কায়াহীন বিরাট শূন্যতা মাত্র! বন্ধুর পার্বত্য-পথে অশ্বারোহণে অন্য সময়ে হয়তো কত রোস্তম, কত ছোহ্‌রাবের কাব্যময়ী বীরত্বমূর্তি তাঁহার মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—কিন্তু ফের্দৌসীর এখন সে অবস্থা নহে। রাজদণ্ডে নির্বাসিত কবি জীবনের সকল আশা বিসর্জন দিয়া, সকল শক্তি ব্যয়িত করিয়া এখন রিক্তহস্তে ভগ্নবুকে, জীবনের অপরাহ্নে অনির্দিষ্ট আশ্রয়পানে ছুটিয়া চলিয়াছেন–তাঁহার প্রাণে প্রজ্বলিত প্রতিহিংসা ভিন্ন এ-সময়ে আর কী ভাব জাগরূক থাকিতে পারে? অলোকসাধারণ কবিপ্রতিভার এরূপ বিড়ম্বনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কি?

আজ কয়দিন অবিরাম অশ্বচালনা করিয়া ফের্দৌসী গজনীর সীমান্ত ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তবু জনরবের ক্ষিপ্রগতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। গজনীর রাজসভায় কবির ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা ইতিমধ্যেই বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন সম্মুখে 'কুহেস্তান'—গজনীর মিত্ররাজ্য। ঐ রাজ্যেও ফের্দৌসীর অশ্বের গতিকে ছাড়াইয়া জনরব রাজদ্বারে আসিয়া ঠেকিয়াছে! সদাশয় রাজা নসরুদ্দিন মহতাসেম কবির অভ্যর্থনার জন্য আগে হইতে লোক পাঠাইয়াছেন।

পথিমধ্যে কবি এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইয়া কুহেস্তানে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার আতিথ্যে ও সৌজন্যে তাঁহার দুঃখভার অনেক লাঘব হইল। তিনি রাজ-সকাশে আপনার সকল দুঃখ-কাহিনী আমূল বিবৃত করিলেন। অধিকন্তু নির্বাসিত হইবার পর, তিনি নূতন করিয়া মাহ্‌মুদের যে কলঙ্ক-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাকে শুনাইলেন। এদিকে, সদাশয় মহতাসেম সুলতান মাহ্‌মুদের প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির এইরূপ একটি দুরপনেয় কলঙ্ক জগতের চক্ষের উপর আত্মবিস্তৃতি করিবে, ইহা তাঁহার নিকট একান্তই কষ্টকর মনে হইল। তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে অনুরোধ করিয়া কবিকে বন্ধুত্বের বিনিময়স্বরূপ উক্ত কাব্যখানি বিনষ্ট করিতে সম্মত করিলেন। এইরূপে মাহ্‌মুদ আপনার অজ্ঞাতসারে এক মহাকলঙ্কের কিয়দংশ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

এদিকে কবি বহুবিধ রাজসম্মান ও উপহারে ভূষিত হইয়া কুহেস্তান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে অনেক নরপতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অনেকে-বা সুলতান মাহ্‌মুদের ভয়ে, শুধু গোপনে কবিকে উপহার পাঠাইয়াই নীরব হইলেন; কেহ কেহ আবার সুলতানের ভয়ে কিছুই করিতে সাহসী হইলেন না। এইরূপে কত রাজ্য রাজধানী অতিক্রম করিয়া কত নদ-নদী, গিরি-উপত্যকা উল্লঙ্ঘন করিয়া, কত বন-পথ দলিত করিয়া, ফের্দৌসী অবশেষে মহানগরী বাগদাদে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

প্রতিভার অগ্নি অধিক দিন ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। ছদ্মবেশী ফের্দৌসী বাগদাদের রাজসভায় আত্মগোপন করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা লোকচক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রধানমন্ত্রী একদিন সত্যসত্যই তাঁহার পরিচয় জানিয়া ফেলিলেন। তখন মন্ত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না। বিশ্ববিশ্রুত ফের্দৌসীকে

এইরূপে বিনা আয়াসে আহরণ করিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং রাজকীয় প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় অবিলম্বে এই অযত্নলব্ধ রত্নটিকে রাজসমীপে উপহার দিলেন। প্রথম পরিচয়ে ফের্দৌসী যে স্তুতিকবিতা আবৃত্তি করিয়া খলিফাকে সম্মানিত করিলেন, তাহাতে শুধু-যে খলিফাই আনন্দে আত্মহারা হইলেন, তাহা নহে—সভাস্থ সকলেই ইঁহার কবিপ্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিল। খলিফা তখন শাহ্‌নামা ও মাহ্‌মুদ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া, সকল বিপদ ও সকল অত্যাচার হইতে ফের্দৌসীকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

৭

ফের্দৌসী গজনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে মাহ্‌মুদ একে একে সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেন। এমনটি কেন হইল? দোষ কাহার?[১] ফের্দৌসী রাজপ্রদত্ত অর্থের অমর্যাদা করিয়াছেন, সত্য। তাঁহার এই ঔদ্ধত্য অমার্জনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই? স্বর্ণমুদ্রার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করাতেই তো কবি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কি ছার অর্থের জন্য মাহ্‌মুদ আজ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট; আর তাহারই ফলে একজন তেজস্বী ব্যক্তি, ন্যায়ের পক্ষে থাকিয়াও, এইরূপ অপদস্থ হইলেন! এই সকল মনে করিয়া মাহ্‌মুদ চিন্তিত হইলেন।

ন্যায়বিচারক বলিয়া মাহ্‌মুদ জগদ্বিশ্রুত, নিজেরও তাঁহার সে গর্ব ছিল। আর তাঁহার কী হইল! আবার চিন্তা করিলেন, দোষ কাহার? উজির ময়মন্দীই তো এই কুমন্ত্রণার, এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মূল কারণ! নীচ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া সে-ই তো এই অপকার্যে মাহ্‌মুদকে প্ররোচিত করিয়াছে। তাহাতেই তো আজ মাহ্‌মুদের কলঙ্ক। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের নিমিত্ত সে রাজচরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছে, নীতিবিধান দূষিত করিয়াছে—নিরপরাধকে নির্যাতন করিয়াছে। সুতরাং ময়মন্দীর অপরাধ গুরুতর! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মাহ্‌মুদ উজির ময়মন্দীকে ষষ্টিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা অর্থদণ্ড করিয়া, মন্ত্রিত্ব হইতে দূরীভূত করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন অনতিবিলম্বে ফের্দৌসীকে তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ পাঠাইয়া দিবেন।

কিন্তু, হায়! মানব ঘটনার অধীন। ঘটনাই জীবনের গতি নির্ণয় করে। ঘটনাকে ধরিয়া জীবন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। ঘটনার স্রোত যেদিকে ধায়, মানব-শক্তিমান বলিয়া গর্বিত মানব—নিতান্ত জড়ের ন্যায় সেইদিকে ভাসিয়া যায়। ঘটনার প্রতিকূলে দাঁড়ায়, এমন শক্তি মানব আজো লাভ করিতে পারে নাই। যে দিন করিবে, সে দিন তাহার চক্ষে বিধাতা ও মানবে কোনো ব্যবধান থাকিবে না।

বিজয়াভ্যস্ত মাহ্‌মুদ পরাজয়ের সংবাদ শুনিতে একরূপ অনভ্যস্তই ছিলেন। তাই ইতঃপূর্বে একটি খণ্ডযুদ্ধে গজনী সৈন্যের পরাজয় হওয়ায়, সে সংবাদে আজ প্রাণে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। কার্যে অশ্রদ্ধা, আমোদে বিতৃষ্ণা, কথায় কথায়

---

[১] কেহ কেহ বলেন সুলতান ফের্দৌসীর নিকট স্পষ্টত কোনো প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, এমন কোনো উল্লেখ নাই। কবির প্রথমকার কতিপয় শ্লোকের জন্য তিনি শ্লোকপ্রতি একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতেই কবি আশান্বিত হইয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রতি শ্লোকের জন্য সুলতান এইরূপ একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিবেন।

ক্রোধ–মাহ্মুদের এখন এই অবস্থা। এমন সময়ে ফের্দৌসীর বিষময় শ্লেষময় শ্লেষরাশি[১] মাহ্মুদের গোচরে আসিল। তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ফের্দৌসীর প্রতি দুইদিনের পূর্বেকার সে শুভ-ইচ্ছা কোথায় ভাসিয়া গেল! তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য কবিকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাগদাদ নগরে লোকসহ দূত প্রেরণ করিলেন। বাগদাদের খলিফাকে লিখিলেন, অবিলম্বে ফের্দৌসীকে শৃঙ্খলিত করিয়া গজনীর রাজসভায় প্রেরণ করা হউক; অন্যথা লক্ষ সেনা সমন্বিত বিজয়বাহিনী অচিরে বাগদাদের সৌধপ্রাসাদ ধূলিসাৎ করিবেক।

গজনীর দূত বাগদাদের রাজসভায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কোনো ফলোদয় হইল না। একে আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা রাজধর্ম নহে; দ্বিতীয়ত বাগদাদের খলিফার তখনো যথেষ্ট প্রতিপত্তি সুতরাং সুলতানের পত্রের প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। পরন্তু সুলতানের উদ্ধত ভাষার প্রতিঘাত স্বরূপ, তদীয় পত্রের ঊর্ধ্বকোণে 'আলেফ' 'লাম' ও 'মিম' এই তিনটি আরবি অক্ষর লিখিয়া পত্র ফিরিয়া পাঠাইলেন।[২]

দূত যখন ফের্দৌসীকে না লইয়া রিক্তহস্তে গজনী ফিরিল, তখন মাহ্মুদ বিস্মিত হইলেন। অধিকন্তু যখন তদীয় পত্রের কোণে খলিফার মন্তব্য লেখা দেখিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রস্ত মন্ত্রিগণকে উক্ত মন্তব্যের অর্থ করিতে আদেশ

১.

"আগার্ শাহ্ রা শাহ্ বুদে পেদর
ব-ছর্ বার্ নেহাদে মারা তাজ ও যর্।
চুঁ আন্দর তাবারেশ্ বোজরগী না বুদ
নে আরাস্ত কে নামে রোজরগান শনুদ
দরখ্‌তে কে তল্‌খ আস্ত উরা ছেরেশ ত
রশ্ দর্ নেশানী–ববাগে বেহেশ্‌ত
ওয়ার আয জুয়ে খোল্‌দাশ বহাঙ্গামে আব
ববেখ্ আঙ্গবান রেষী ও শীরে নাব
ছরঞ্জামে গওহর বকার আওরাদ
হোমা মিওয়ারে তলুখ রব আওরাদ।"
ইত্যাদি।

অনুবাদ :

রাজবংশে হ'ত যদি জনম তোমার
বরষিতে স্বর্ণমুদ্রা মুকুটে সোনার।
উচ্চমান নাহি যার বংশের ভিতর
কেমনে সহিবে সেই মানীর আদর?
তিক্তবীজ হতে যেই তরুর জনন
নন্দন কাননে তারে করহ রোপণ;
সিঞ্চন করহ মূলে মন্দাকিনী-ধারা
মধু আর দুগ্ধে ভর খাদ্যের পশরা–
তথাপি ফলিবে তার আপন স্বভাব,
সতত সে তিক্ত ফল করিবে প্রসব!
ইত্যাদি।

২. তৎকালে শুধু উচ্চস্থানীয় লোকেই নিম্নস্থ লোকের পত্রের শীর্ষদেশে মন্তব্য লিখিতে পারিতেন।

করিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেহই এই তিন অক্ষরের সাঙ্কেতিক অর্থ বুঝিতে পারিল না। মাহ্‌মুদের তখন মনে হইল—হয়তো একজন আজ এ-সভায় থাকিলে এতক্ষণ এ-পত্রের অর্থ করিতে পারিত। একজন—ফের্দৌসী। কিন্তু পরক্ষণেই হৃদয় হইতে অপরাধীর প্রতি এ অন্যায় অনুকম্পা দূরীভূত করিলেন। যদিও হৃদয় ভিতরে ভিতরে এই পুরাতন বন্ধুর প্রতি অনুকূল হইয়া আসিতেছিল তথাপি মাহ্‌মুদ বলপূর্বক হৃদয়কে কঠিন করিয়া লইতেছিলেন। অনুপস্থিতিই লোকের ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করিয়া দেয়। জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল যাঁহার মধুসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে, অভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অধিকতর পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু তথাপি মাহ্‌মুদ হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া লইলেন এবং আর একবার সভাস্থ সকলকে খলিফার মন্তব্যের মর্মোদ্ধার করিতে বলিলেন। মন্ত্রীগণ নীরব! তখন জনৈক তরুণ যুবক সাহসে ভর করিয়া উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিলেন—পবিত্র কোরানের ২৭শ অধ্যায়ের প্রথমে 'আলেফ,' 'লাম' ও 'মিম' এই তিনটি অক্ষর লিখিত আছে এবং উহার পর একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবত খলিফার এই অক্ষরত্রয় কোরানের সেইস্থানের দিকেই নির্দেশ করিতেছে এবং মন্তব্যস্বরূপ কোরানে উল্লিখিত ঐ ঘটনাটিই সূচিত হইতেছে। ঘটনাটি এইরূপ :

যে-বৎসর মহাপুরুষ মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন, সেই বৎসর ইথিওপিয়ার খ্রিস্টান নরপতি এব্রাহা এবনেসারা এক অপূর্ব গির্জা নির্মাণ করেন এবং মক্কাবাসিগণকে মক্কার প্রসিদ্ধ উপাসনা-মন্দির কাবাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত গির্জায় উপাসনা করিতে প্রলুব্ধ করেন। ইহাতে মক্কার অধিনায়ক কোরেশবংশীয়গণের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ফলে ইথিওপিয়ার বিপুল সেনাদল লক্ষাধিক হস্তী লইয়া মক্কায় অভিযান করে। মক্কার সেনাদল তখন সামান্য ছিল কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধের সময় সুবৃহৎ মেঘখণ্ডের ন্যায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া একদল চড়ুই পাখি বিপক্ষ সৈন্যদলের উপর হইতে তাহাদের হস্তীগুলির মস্তক লক্ষ করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে অসংখ্য হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনেকগুলি প্রাণত্যাগও করিল। অবশিষ্ট দল উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। এইরূপে ইথিওপিয়ার বিরাট সৈন্যদল অচিরে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

এই গল্প হইতে বুঝা যাইতেছে খলিফার শক্তি সামান্য হইলেও তাঁহার হস্তে মাহ্‌মুদের মহাবাহিনীর ঐরূপ পরাজয় হইতে পারে—কারণ খোদা ধার্মিকের সহায়।

মাহ্‌মুদের নিকট যুবকের এই ব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া মনে হইল। খলিফার মন্তব্য পাঠ শেষ হইল কিন্তু মাহ্‌মুদের পূর্বের সে-ক্রোধ আর দৃষ্ট হইল না। সম্ভবত কোরানের পবিত্র বাণীতে অভিব্যক্ত মন্তব্য মাহ্‌মুদের হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটাইয়া থাকিবে। মাহ্‌মুদ বাগদাদ-খলিফার এই তেজস্বিতা দর্শনে উত্তেজিত না হইয়া বরং তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবানই হইয়াছিলেন। যুদ্ধের বাসনাও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল।

আর এই অবসরে আবার ফের্দৌসীর সেই পূর্বস্মৃতি তাঁহাকে আকুল করিতে আসিল! সেই যৌবনের সহচর, প্রৌঢ়ের সুহৃদ, বার্ধক্যের আনন্দ-উৎস—ফের্দৌসী; তাঁহারই অবিচারে, তাঁহারই নির্দয়তায় আজ দেশদেশান্তরে তাঁহার জীর্ণদেহভার লইয়া দারুণ অশান্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একে একে সকল কথা তাঁহার মনে পড়িল। একদিকে ফের্দৌসীর সেই সশ্রুনয়ন বেদনাকাতর-মুখ, অন্যদিকে তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ গর্বিত-মূর্তি—দুই স্মৃতি মাহ্‌মুদের মনের ভিতর মল্লযুদ্ধ জুড়িয়া দিল। জয়-পরাজয়

উভয় দিকে—একবার কৃতকার্যের জন্য অনুতাপ ও তাহার ফলে অনুকম্পা, আবার আহত-আত্মাভিমানজনিত ক্রোধ—পর্যায়ক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় অনেক সময় মনের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ফেদৌসীর বিষয়ে মাহ্মুদের মন যখন এইরূপ দোলায়মান, সেই সময় এমনি একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিল। ভারতীয় কোনো বিজিত নরপতি এইসময় মাহ্মুদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। মাহ্মুদ ভীষণ ক্রোধভরে জ্বলন্ত ভাষায় উক্ত নরপতির নামে এক পত্র লিখাইতেছিলেন। উপসংহারে গিয়া একটি উপযুক্ত বাক্যের জন্য তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইল। কিছুতেই তাঁহার মনের মতো কথা জুটিতেছিল না। তখন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ্নামা হইতে একটি ক্ষুদ্র অংশ আবৃত্তি করিলেন। উহা এতই স্থানোপযোগী, এতই তেজঃব্যঞ্জক ছিল যে, সুলতান মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ শ্লোক কাহার? যখন শুনিলেন উহা ফেদৌসীর, তখন সুলতানের স্বীয় পূর্বাচরণের জন্য মনস্তাপের সীমা রহিল না। আত্মগ্লানির নিকট আত্মাভিমান পরাভব মানিল। সুলতান ফেদৌসীর প্রতি অবিচারের প্রতিকার মানসে উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে আরো একটি আনুকূল্য ঘটনা ঘটিল। নসরুদ্দিন মহতাসেমের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মাহ্মুদের যখন মানসিক অবস্থা ঐরূপ, সেই সময় মহতাসেমের পত্র আসিয়া সুলতানের হস্তে পৌছিল। মহতাসেম তাঁহার ফেদৌসীর সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন : মহীয়ান্ সুলতান! পুণ্যকার্যের জন্য যাঁহার গৌরবময় জীবনী পারস্যের সীমান্ত হইতে তুর্কিস্তান পর্যন্ত গীত হইতেছে; মহানগরী গজনীকে যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞানের পাদপীঠে পরিণত করিয়াছেন; কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস যাঁহার উদ্যমে নব প্রাণ লাভ করিয়াছে—তাঁহার পক্ষে বিশ্ববিশ্রুত যুগকবি ফেদৌসীকে এইরূপে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ নিজ কার্যে, নিজ প্রয়োজনে ব্যয়িত করিয়া তাঁহার অমানুষি শক্তি নিজ সন্তোষার্থে এতকাল নিয়োজিত রাখিয়া, এবং দুর্লভ কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রসূন (শাহ্নামা) বিনামূল্যে আহরণ করিয়া, এখন অন্যায়রূপে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করা, জীবনের সায়াহ্নে তাঁহাকে এইরূপে পথের ভিখারি করা একান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এ অধীনের বন্ধুত্বের বিনিময়ে নির্বাসিত কবিকে পুনর্গ্রহণ করুন; মর্মাহত হৃদয়ের প্রতিকার করুন। জগতের ইতিহাসে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আবার মেঘমুক্ত রবির ন্যায় সগর্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলুন—সুলতান মাহ্মুদ অবিচারী নহেন।

এই তেজপূর্ণ মাদকতাময় পত্র পাইয়া মাহ্মুদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি সর্বান্তঃকরণে ফেদৌসীকে ক্ষমা করিলেন। সে সংবাদ শীঘ্রই বাগদাদে পৌছিল! এই ক্ষমা ঘোষণার পর ফেদৌসী জন্মভূমি সিরাজনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

উপসংহার

ফেদৌসী গজনীর দীর্ঘপ্রবাস ও বাগদাদের অজ্ঞাতবাস শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তদীয় স্বদেশ সিরাজনগরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অজ্ঞাতবাসের পর যখন রাজকীয় ক্ষমা লাভ করিলেন তখন ফেদৌসীর জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিনশত বৎসর পূর্বে

ইংলন্ডের একজন মহাকবিরও এইরূপ দশা হইয়াছিল। কি কবিপ্রতিভা, কি কাব্যাদর্শ, কি নিজ চরিত্র সকল বিষয়েই তিনি ফেদৌসীর অনুরূপ ছিলেন। ফেদৌসীর ন্যায় তিনিও অতীত জীবনের গৌরবময় মধ্যাহ্ন ও মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের মর্মস্পর্শী স্মৃতির পানে চাহিয়া বার্ধক্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। আপনার বিষাদময় অশ্রুকণায় তিনি স্যামসন এ্যাগনিস্টিস নামক অক্ষয় মর্মরমন্দির গাঁথিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ফেদৌসী জীবনে সে অবসর পান নাই।

বৃদ্ধ কবি একদিন নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একটি পথবাহী বালক গাহিয়া উঠিল—আগার শাহ্‌রা শাহ্‌বুদে পেদর—ইত্যাদি। বালক জানিত না, যাঁহার লেখনী-প্রসূত শ্লেষগীত এইরূপে প্রাসাদ হইতে নগরের রাজপথ পর্যন্ত লোকমুখে গীত হইতেছে, তিনি তাহার নিকটেই বিদ্যমান। বালক নিশ্চিন্তমনে গাহিতেছিল। কিন্তু তাহাতে যে কী বিষময় ফল ফলিল সে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। বাল-কণ্ঠের এই ধ্বনিতে ফেদৌসীর প্রাণের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল। অতীত জীবনের সকল কথা তাঁহার মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে এ গুরুভার সহিল না। সেই প্রথম জীবনের অফুরন্ত উদ্যম, সেই বুকভরা আশা লইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অক্লান্ত পরিশ্রমে কাব্য প্রণয়ন—তারপর সেই অবিচার—জীবনের সেই দুর্বিষহ ব্যর্থতা—সকল স্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া বৃদ্ধের অবসন্ন প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন চুরমার হইয়া গেল। দারুণ মানসিক পীড়ায় তিনি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এ ঘটনার কয়েক দিন পরেই ফেদৌসীর প্রাণপাখি তাঁহার দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যে-দেশে অত্যাচার নাই, অবিচার নাই, সেই দেশে চলিয়া গেল!

একদিকে ফেদৌসীর জন্য সুলতানের উপঢৌকন সিরাজনগরে পৌছিল। পূর্ব দ্বার দিয়া যখন রাজ-উপহার প্রবেশ করে, পশ্চিম দ্বার দিয়া ফেদৌসীর জীবনের শেষচিহ্ন সমাধিক্ষেত্রের দিকে নীত হইতেছিল। কবির একমাত্র কন্যা ছিল। কন্যা নয়—যেন কবির 'তেজস্বিতা' মূর্তিমতী। অনেক অনুরোধেও তিনি এ রাজোপহার গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে রাজকর্মচারীরা সুলতানের অভিমত লইয়া ফেদৌসীর জীবিতকালের ঈপ্সিত কার্যগুলিতে উক্ত অর্থ পর্যবসিত করিলেন।

বহুকাল পরে পর্যটকগণ ফেদৌসীর প্রাপ্য অর্থে নির্মিত সিরাজনগরের পুল ও পান্থশালা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। প্রসিদ্ধ চরিতাখ্যায়ক দৌলতসার গ্রন্থে এ-কথার উল্লেখ আছে। কালের নির্মম করস্পর্শে এখন আর সে-সকলের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু নয়শত বৎসর পূর্বে পারস্যের সিরাজনগরে যে-মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, জগৎ তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। যতদিন ভাষা আছে, যতদিন শাহ্‌নামা আছে, ততদিন ফেদৌসীর অরমত্ব কাড়িয়া লয়—কালের এতটুকু স্পর্ধা আজিও হয় নাই।

ওমর খাইয়াম

দৈনন্দিন জীবনের কল-কোলাহল ছাড়াইয়া যিনি চিন্তার রাজ্যে একটু উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছেন, বিশ্বের কার্যপ্রণালী যিনি চিন্তার নয়নে একটু স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে কখনো আনন্দের উদ্দাম হাসি ধ্বনিয়া উঠিতে পারে না। কুসুম হাসে, সুরভি-সম্ভারে দিগন্ত আকুলিত করে, কুসুমপ্রাণা-রমণীর কণ্ঠহারে শোভা পায়—এ সকল আনন্দের কথা বটে। কিন্তু যিনি একবার গভীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করিয়াছেন, কুসুমের হাসি তাঁহার প্রাণে আনন্দ ঢালিয়া দেয় না, পরন্তু অব্যক্ত বিষাদের ম্লানিমা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে।

শ্যামসুষমায় লতাটি বাড়িতেছিল, কে তাহার হরিত কবরীতে সোনার প্রসূন গুঁজিয়া দিল? কালের ইঙ্গিতে উহা কোথা হইতে আসিল, মুহূর্তের জন্য হাসির রেখা ফুটাইয়া আবার কোন্ অজানা দেশের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যে উপাদানে ফুলের দেহ গঠিত তাহা তো এখনো ধরার বুকে লুটাইয়া আছে–তবে কিসের অভাবে আর সে ফুল হাসে না, আর সে গন্ধ দান করে না; ধূলির অঞ্চলে কেন আজ সে আত্মগোপন করিতেছে! সে তো কুসুম নয়, সে যে কুসুমের কঙ্কাল! যে জীবনপ্রদীপ তাহার ভিতর দিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মবিকাশ করিয়াছিল, সে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কে জানে; কেহই তো তাহা বলিতে পারে না। এ সংসার-রঙ্গমঞ্চের সে গোপনকক্ষ কোথায়–যেখান হইতে এই অভিনেতার দল মোহনসাজে সজ্জিত হইয়া দর্শকের আনন্দবর্ধন করিতে আসে? কোন্ মায়া-যবনিকা আসিয়া অজ্ঞাতে আবার তাহাদের ঢাকিয়া দেয়? ধরার কৃষ্ণফলকে (Black board) কোন্ মহালেখক সমগ্র পঙ্ক্তিমুদ্রিত করিয়া আবার মার্জনী ক্ষেপনে সব মুছিয়া লইতেছে? কে এ বিরাট রহস্যমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে?

সৃষ্টির অনন্ত তরঙ্গ উদ্দামপ্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে; সে প্রবাহে অযুত কোটি বুদ্বুদ নিমেষে ফুটিয়া আবার নিমেষে মিলাইয়া যাইতেছে। মানুষ সেই অযুত কোটির মধ্যে একটি। নির্মম নিয়তির বিধানে কোথা হইতে আসিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছি! কোথায় ছিলাম–কেহ জানে না! কোথায় যাইতেছি তাহাও বলিতে পারি না! এটা আলো না স্বপন–কে বলিবে? কত জ্বালা, কত দাহ বুকে বহিয়া, আশার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি–হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িতেছি। এ নিয়তিচক্রের উপর তো আমার কোনো অধিকার নাই। আমি যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র :

> "There's Divinity that shades our ends
> Rough hews them how we will."–*Shakespeare.*

শেক্সপিয়ার বলিয়াছেন উহা Divinity–দৈবশক্তি। কিন্তু সে যদি Divinity হইবে, তার কার্যকলাপ Divinity নয় কেন? সে যদি Divinity হইবে তবে কেন ঐ আশ্রয়হীন অত্যাচারিত বিধবার একমাত্র আশার স্থল, তার ভগ্ন বুকের একমাত্র অবলম্বন, পুত্ররত্ন অকালে তার পিপাসিত হৃদয় চূর্ণ করিয়া শমনের দ্বারে খসিয়া পড়িল? ঐ যে

ভিখারিনি, 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করিয়া সাশ্রুনয়নে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, কত কষ্ট কত পরিশ্রমে সে তার পর্ণকুটিরখানি গড়িয়াছিল; কত দুঃখে সে ভগ্নকুটিরে, দুঃখের দিন আহার-নিদ্রা ভুলিয়া আপন সন্তানদের মানুষ করিয়াছে। আজ যখন তাহারা মানুষ হইয়া সুখের সন্ধান পাইয়াছে, অমনি কাল আসিয়া অভাগিনীর দুটি চক্ষু মুদিয়া দিল! আশার দীপ নিভিয়া গেল! এ কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা যদি হইবে, তবে ঐ নবজাত শিশু কোন্ পাপের ফলে রোগ-যাতনায় ছটফট করিতেছে? সরলা বালিকা সবেমাত্র স্বামীসুখে সোহাগিনী হইয়াছে, কেন তার সীঁথির সিন্দুর অকালে মুছিয়া গেল? সুখের ক্রোড়ে লালিত লক্ষপতি, মাতাপত্নী ফেলিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় হইতেছে—আর ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করিয়া পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে, পথিকের চরণতলে লুটিয়া পড়িতেছে—কেন তার দুঃখের জীবনের অবসান হয় না? মনোহর মৃগশিশু কোন্ পাপে শার্দুলের উদরপূর্তি করিতেছে? কেন জগতে এ বিরাট হত্যার অভিনয়, কেন এ উহাকে মারিয়া খাইতেছে? যে Divine দেবতা এই হত্যা অভিনয়ের উদ্যোক্তা, তার কোন্ Divine উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইতেছে?

ঐ দেখ, দার্শনিক সপেনহ'র তারস্বরে বলিতেছেন—না না কখনই নয়, সে দেবতা Divine নয়, উহা অচেতন প্রেরণা মাত্র (unconscious will)—উহা অন্ধশক্তি, এক সুদূর লক্ষ্যের পানে অনন্ত মহাযাত্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে! উহা কিছু বুঝে না, কিছু তার কানে পশে না। এ ধরার আকুল ক্রন্দন, ব্যথিতের মর্মবেদনা, উৎপীড়িতের সহস্র মিনতি–কিছু তার হৃদয় স্পর্শ করে না। লক্ষ লক্ষ বীজ সে সৃষ্টির মহাপ্রান্তরে বিচ্ছুরিত করিতেছে। কতক অনুকূলক্ষেত্রে উন্মেষিত হইয়া মনোরম শস্যে পরিণত হইতেছে; কতক বা প্রস্তরখণ্ডের উষর পৃষ্ঠে অঙ্কুর না উঠিতেই শুকাইয়া যাইতেছে। আর কতক দুয়ের মাঝে, জীবন্মৃত অবস্থায় পৃথিবীর জঞ্জাল লইয়া টিকিয়া আছে। আজ যে টিকিল দুদিন পর সেও মরিবে। আজ যে আপন গৌরবে হাসিতেছে, দুদিন পরে সে কর্তিত হইয়া গৃহস্থের অঙ্গনে লুটাইয়া হাহাকার করিবে।

"The boast of Heraldry the pomp of power
An all that beauty all that wealth ever gave
A wait alike the inevitable Hour
The paths of glory lead but to grave." –*Gray.*

মৃত্যুই জীবনের অপরিহার্য পরিণাম। বৃথা সে-শক্তির নিকট কাতর প্রার্থনা–বৃথা তার নিকট মুখের আকুল প্রার্থনা, বৃথা পুণ্যের পুরস্কার ও অত্যাচারের প্রতিকার ভিক্ষা। ওমর খাইয়াম বলিয়াছেন—না, সে শক্তি অজ্ঞান নয়, অচেতন নয়, সে সজাগ শক্তি; সে স্বেচ্ছাচারী বিরাট অভিনেতা। সে আপন মনে আপনি ভাবে, আনন্দ করে, লীলা করে, ভাঙে-গড়ে; আপনার মন লইয়া আপনি মত্ত থাকে। তাইতো—সে যদি অজ্ঞান হইত তাহা হইলে এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এমন শৃঙ্খলায় চলিত না। যে-প্রচণ্ড শক্তিতে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বিমানপথে বিহার করিতেছে, কোন্ দিন তাহারা পরস্পরের সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ওমর খাইয়াম কি ইহাকে অচেতন অন্ধশক্তির লীলাভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারেন? নদীর সুধামাখা কলনাদ, পাখির কূজন-গীতি, শ্যামল সৈকতের অপূর্ব শোভা—ওমরের প্রাণে কত আনন্দ দেয়; অচেতন শক্তির সাধ্য কি যে উহা সৃষ্টিকে এমন সুষমা জড়িত করিতে পারে। ওমর কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন? ওমর তাহা বলেন না।

তবে ওমর কী বলেন? তিনি বলেন, সৃষ্টির যে এই সৌন্দর্য-সমাবেশ, পৃথিবীর যে এই লীলাবৈচিত্র্য—ইহা এই স্রষ্টার নিজের সুখের জন্য। তোমার আমার জন্য নহে। তুমি আমি তাঁর সৃষ্টির উপকরণ মাত্র, তাঁর সুখাস্বাদনের উপাদান মাত্র। কুম্ভকার সহস্র বিচিত্রাঙ্গ মৃৎপাত্র দৈনিক গড়িতেছে—কোনোটি ভাঙিতেছে, কোনোটি চিড়িতেছে—কোনোটি বা অপরের আঘাতে বিকৃত হইয়া যাইতেছে। কই কুম্ভকার তো সেজন্য ব্যস্ত নহে। যে ভাঙে সে ভাঙুক; যে থাকে সে থাকুক; সহস্রের মধ্যে যাহা টিকে তাই যথেষ্ট। কোন্‌টি ভাঙিল, কোন্‌টি থাকিল, তাহা দেখিবার তাহার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরাও সেই বিশ্বশিল্পীর প্রস্তুত মৃৎপাত্র—আমাদের সুখদুঃখে সে নির্মাতার কিছু আসে যায় না। সুতরাং তোমার দুঃখের প্রতিকার কে করিবে—তোমার সুখেই বা কাহার অন্তর্দাহ হইবে; তোমার ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ের শোকদুঃখজনিত তরঙ্গাভিঘাত যেমন তাঁহার দৃষ্টিতে আসে না—তোমার ভোগবিলাস, আনন্দ কোলাহলও তেমনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। যে বলে এ জীবনে দুঃখকে বরিয়া লও, পরলোকে স্বর্গসুখ পাইবে—সে যেমন ভ্রান্ত; যে পরকালের নরকাগ্নির উল্লেখ করিয়া এ জীবনের সুখরাশি বর্জন করিতে বলে সেও তেমনি ভ্রান্ত। দুঃখের কশাঘাতে তুমি আমি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে অপর কোটি-কোটি জীবন এ সৃষ্টিকে মুখরিত করিয়া রাখিবে। তুমি আমি কে যে এই পৃথিবীর বাহিরে, মরণের পরপারে আমাদের জন্য বিধাতা এক বিরাট স্বর্গপুরি গড়িয়া রাখিবেন। গৃহী হাঁড়ি লইয়া কার্য করে—হঠাৎ যখন কোনো আঘাতে সেটি ভাঙিয়া যায়, সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন করিয়া কাজে লাগে। কবে সে ভগ্ন-খোলার জন্য সুবর্ণ মন্দির গড়িয়াছে? এই কথাটি কবি তাঁহার কূজনামায় অতি স্পষ্টভাবে গাহিয়াছেন। মরণের পর যে মানুষ আবার বাঁচিয়া ওঠে, কবি এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না।

"Oh! come with old Khayam and leave the wise
To talk one thing is certain that life flies;
One thing is certain the rest is lies
The flower that once has blown for ever dies."

—Fitzerald.

যিন্‌হার ব'কাশ ম'গো তুই রাজে নেহোফ্‌ত
হর লালায়ে পয মোরদা না খাহান বেশেগোফত।

—খাইয়াম।

সব বুলি মিছা; শুনহ গোপনে একটি বচন সত্য সার—
যে ফুল নিশায় পড়িছে ঝরিয়া সে নাহি কখনো ফুটিবে আর।

অতএব পরলোকের ভরসায় জীবনকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ভিতর দিয়া জীবন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। এ জীবনের সার্থকতা কর। প্রতি মুহূর্তটিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া উপভোগ কর—স্ফূর্তি কর, আনন্দ কর। যে-মুহূর্ত পিছনে পড়িল উহা আর ফিরিয়া আসিবে না, উহার জন্য অনুশোচনা করিও না। কবি বলেন :

সাকী গমে ফারদায়ে হারিফান্ চে খোরী
পেশ্ আর্ পেয়ালারা কে শব্ মিগোজারান্।

—খাইয়াম।

কালি কী হইবে সেই ভয়ে আজ

অনুশোচনায় কী ফল বল;
আয়ু নিশীথিনী অবসান হয়—
হে সাকি, পেয়ালা অধরে তোল।

কবির মতে যাহারা পার্থিব রাজত্ব বা ঐশ্বর্যের জন্য, ভাবী সুখের আশায়, বর্তমানে কঠোর সাধনায় জীবনের মুহূর্তগুলি ব্যয় করিতেছে; অথবা যাহারা পরলোকে স্বর্গলাভাশায় এ জীবনে ঘোর তপস্যায় কাল হরণ করিতেছে, সর্ববিধ ভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া জীবনকে নিষ্পেষিত করিতেছে—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। সুখের মাহেন্দ্রযোগ হেলায় হারাইয়া তাহারা দূর অনাগতের আশায় বসিয়া আছে হা! হা! কী দুরাশা!

How sweet the mortal sovereignty think some;
Others, how blest the Paradise to come!
Ah take the case in hand and waive the rest
Oh! the brave music of a distant drum![১]

—Fitzerald.

শেক্সপিয়ার ও ওমর খাইয়ামের তুলনা করিয়া দার্শনিক অধ্যাপক পেরি, বলিয়াছেন—এক হিসাবে ওমর খাইয়ামের স্থান শেক্সপিয়ারের উপরে। উভয়েই জীবনরহস্য (The Problem of life) পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু মানবের সুখদুঃখের ভিতর শেক্সপিয়ার যতদূর প্রবশ করিয়াছিলেন, ওমর তদপেক্ষাও গভীরতর নিমগ্ন হইয়াছিলেন।[২]

জীবন

পারস্য-কবিদিগের অধিকাংশেরই জীবনের আখ্যায়িকা সাধারণের অজ্ঞাত। তাঁহারা 'আমার জীবন' বা 'জীবনস্মৃতি' লেখা দূরের কথা, লোকচক্ষু হইতে যথাসাধ্য আত্মগোপনের জন্যই প্রয়াস পাইতেন। মহাকবি হাফিজ যখন কাশীতে ছিলেন তখন একদিন অযোধ্যার নওয়াব আসাফউদ্দৌলাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তদীয় দ্বারবান কর্তৃক বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল। নওয়াব তখন কবির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন—দরবেশরা দ্বারবান না বাইয়েদ। কবি ভিতর হইতে উত্তর পাঠাইলেন—বাইয়েদ্, তা সাগে দুনিয়া নেয়াইয়েদ[৩]—পারস্য-কবিদের দস্তুরই এই। অর্থ, যশ বা প্রতিপত্তি তাঁহাদের কাম্য ছিল না; নির্জন সাধনায় তাঁহারা জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন। তাই তাঁহাদের জীবনের কার্যকলাপ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

---

১. কওমে যে গোজাফ্ দর্ গরুর ওফ্তাদন্দ্
ওয়ান্দর তলবে হুর ও কসুর ওফ্ তাদন্দ;
গোইয়ান্দ্ ম'রা চুঁ সুর বা হুর খোশ্ আস্ত,
মান্ মী গোফ্ত কে আবে আঙ্গুর খোশ আস্ত,
ইঁ নকদ বেগীর ও দস্ত্ আজাঁ নসিয়া বেদার
কে আওয়াজে দহল শনি দন্ খোশ আস্ত।

—খাইয়াম।

২. An Approach to Philosophy by Parry, প্রথম অধ্যায়।

৩. নওয়াব : দ্বারীর কী প্রয়োজন দরবেশের দ্বারে?
কবি : ভবেরে কুকুর যাহে প্রবেশিতে নারে।

করিত না। কত সুগন্ধি কুসুম-যে এইরূপ বিজনে প্রস্ফুটিত হইয়া, বিজনে ঝরিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জনবররূপ মরুর বাতাস কদাচিৎ যাঁহাদের সুরভির সন্ধান লোকালয়ে আনিত, তাঁহারাই কোনোমতে এখনো বাঁচিয়া আছেন। তন্দ্রায়-শ্রুত-সঙ্গীতের মতো তাঁহাদের জীবনস্মৃতি অর্ধেক লোকের স্মরণে আছে, অর্ধেক লোকের কল্পনায় চিত্রিত।

গিয়াসউদ্দীন আবুল ফাতাহ্ ওমর বিন্ ইব্রাহিম অল্ খাইয়াম ওরফে খাইয়েমী এই শেষোক্ত দলেরই একজন। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধ নেশাপুরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু কবে কোন্ সনে কোন্ দিনে সে স্বর্গের বীণা মর্ত্যে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহার কোনো ঠিকানা নাই। কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ তিনি আলোকিত করিয়াছিলেন, কোন্ রত্নগর্ভা রমণী তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে জগতের উৎকণ্ঠা কখনো দূরীভূত হইবার নহে।

কৈশোরে এই উদাস বালক নেশাপুর বিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মোয়াফিকের পাদমূলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নির্জনে বসিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনা করিতেন, ইউরোপীয়েরা তাঁহাকে The Astronomer poet বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অনুবাদক ফিজ্‌রেল্ড বলেন— কবিতা না লিখিলে হয়তো তিনি গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়াই অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু কবিত্বের অত্যধিক খ্যাতি তাঁহার সে যশকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মহাকবি গ্রে-র সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গ্রে দরিদ্রের পরিণাম দেখিয়া অশ্রু ত্যাগ করিয়াছেন, ওমর বিশ্বমানবের পরিণাম ভাবিয়া নৈরাশ্যের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন।

নেশাপুরে দুইজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক ওমর খাইয়ামের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম 'সিয়াসৎনামা'র লেখক, নিজাম-উল মুল্‌কের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে একান্ত বিরল। পারস্যের তুস নগরে ইঁহার জন্ম হয় এবং ইনি খোরাসানের শাসনকর্তা আল্‌প্ আর্সালানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আল্‌প্ আর্সালানের নামে নিজাম বিখ্যাত নহেন, পরন্তু নিজামই আল্‌প্ আর্সালানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আল্‌পের পুত্র মালিক শাহ্ একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। নিজাম তাঁহারও মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষ-যে শুধু মালিক শাহ্‌কে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জন্য যে 'সিয়াসৎনামা' নামক শাসন-সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়া যান তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

ওমরের দ্বিতীয় বন্ধু হাসন সাব্বাও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁহার বিপুল ক্ষমতাকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও রাজরক্তপাতের জন্য ইতিহাসে Hasan Sabba the Assassin নাম লাভ করিয়াছেন।[১]

কথিত আছে, যাহারা ইমাম মোয়াফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত তাহারা জগতে বিশেষ সৌভাগ্যশীল হইত। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই নিজামের পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থে নেশাপুরে প্রেরণ করেন। যাহা হউক, কৈশোরে তিন বন্ধু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সংসারে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান হইবেন, তিনি অপর দুইজনের জীবনযাত্রায় সহায়তা করিবেন। কালক্রমে নিজাম যখন রাজমন্ত্রী হইলেন তখন তিনি এই কথা স্মরণ করেন। তাঁহারই অনুগ্রহে কবি নেশাপুরে বসিয়াই খোরাসানের রাজসরকার হইতে বার্ষিক ১০০ সুবর্ণমুদ্রা বৃত্তি পাইতেন। তাহাতেই কবির জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। বলাবাহুল্য,

---

১. অধুনা অনেকে বলেন, ওমর খাইয়াম সম্বন্ধে তিনবন্ধুর যে কিংবদন্তি আছে উহা অনৈতিহাসিক।

মুসলমান আমলে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের জন্য এরূপ বৃত্তি নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নিজাম–উল্ মুল্ক তদীয় ওসায়া নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—ওমর খাইয়ামই সাতজন পণ্ডিত সহযোগে জালালী সনের সংস্কার সাধন করেন।[১] জ্যোতির্বিদ্যায় (astronomy) তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিলেও মালিক শাহের দরবারে জ্যোতিষী (astrological) গণনার জন্যই তাঁহার অধিক সুখ্যাতি ছিল। কথিত আছে তিনি একটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার করেন এবং তাহার নাম জালাল রাখিয়াছিলেন।

শাহারস্তানী তদীয় 'তারিখুল হুকামা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—ওমর গ্রিসদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ওমরের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ ইমাম গাজ্জালিও তদীয় পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

ওমর খাইয়ামের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোনো কথাই জানা যায় না। তিনি কীভাবে জীবনের কার্য নির্বাহ করিতেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ছিল কিনা, এ সকল কোনো কথাই বলিবার উপায় নাই। তাঁহার মত ছিল—

দররাহ্ চুনান রাও কে ছালামত না কুনান্দ
বা খাল্ক্ চুনান যী কে কেয়ামত না কুনান্দ
দর মস্‌জেদ আগার রাও চুনান রাও কে তুরা
দর পেশ না খান্দান ও এমামত না কুনান্দ।

অর্থাৎ এমনভাবে পথ চলিবে যে, কেহ তোমাকে ছালাম বলিবার সুযোগ না পায়। সমাজে এমনভাবে জীবনযাপন করিবে যে, কেহ তোমাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া না উঠে। যদি মসজিদে যাও এমনভাবে যাইবে যে, কেহ তোমাকে আগে না ঠেলে ও এমাম না করে।

তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধর্মজগতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; তিনি কোনো শাস্ত্রীয় উপকথা বিশ্বাস করিতেন না। কোনো আচার-পদ্ধতি বা ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা যে ঈশ্বরের মনস্তুষ্টি করা যায় এ-কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রে কথিত ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহাও নির্ণয় করিবার কোনো উপায় নাই। তবে

---

১. জালালী সন সুপ্রসিদ্ধ মালিক শাহের প্রচলিত ও হিজরি ৪৭১ সনের ১০ রমজান হইতে আরম্ভ। মালিক শাহের আর এক নাম জালালউদ্দীন ছিল। কেহ কেহ বলেন ত্রয়োদশ পোপ গ্রিগয়ির সময়ে খ্রিস্টীয় সনের যে সংস্কার হয়, ওমরের সংস্কার তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সমীচীন। ঐতিহাসিক গীবন বলেন : — "Jalali era surpasses the Julian and approaches the acuracy of the Gregorian style.

তিনি অঙ্কশাস্ত্রের যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন–তন্মধ্যে বীজগণিত বহুদিন পূর্বে মি. উপেক (Weopeke) কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। লিডেন (Leiden) লাইব্রেরিতে আজও তাঁহার রচিত উইক্লিড-জ্যামিতির একখানি টীকা রক্ষিত আছে। গথা লাইব্রেরিতেও তাঁহার রচিত রসায়ন-সূত্রসংক্রান্ত একখানি পুস্তক রহিয়াছে। উহাতে ধাতব পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং অনুপাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য সংমিশ্রণ করিলে মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার গণিত-সম্বন্ধীয় মূল পুস্তক লিভেন, প্যারিস ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত হইয়াছে। উহা আরবি ভাষায় লিখিত। (বীজগণিত লিভেন লাইব্রেরি নং ১০২০; প্যারিস লাইব্রেরি নং ২৪৫৮/৭, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি নং ৬৩৪/১০, জ্যামিতি অনুশীলনী লিডেন লাইব্রেরি নং ৯৬৭। ধাতব রসায়ন–গথা লাইব্রেরি নং ১১৫৪/১১)। ওমর খাইয়ামের বীজগণিত বহু শতাব্দী ধরিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

তাঁহার 'কূজানামা' পাঠে বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবীর এক স্রষ্টা আছেন এ-কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নানারূপ গল্পের অবতারণা করিয়া লোকের মনে অদ্ভুত সংস্কারের সৃষ্টি করে—কখনো স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া লোককে উৎসাহিত করে, কখনো বা নরকের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে ও অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে লোককে আচার অনুষ্ঠানের দিকে প্ররোচিত করিয়া নিজেদের উদরের সংস্থান করে, তাহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে-সকল ভণ্ড দরবেশ লোকালয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন আশীর্বাদের বলে শিষ্যগণকে স্বর্গের সোপানে উত্তীর্ণ করিবে এই বিশ্বাসবাণীর দ্বারা জনসাধারণকে প্রতারিত করে, তাহাদিগকেও তিনি দারুণ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার প্রাণটি অতি উদার ছিল, তিনি সকল বিষয়েই স্বাধীনচেতা ছিলেন। আর যাঁহারা তাঁহারই মতো সকলপ্রকার সংস্কারের বাঁধ ভাঙিয়া মুক্তির রাজ্যে বিহার করিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি কূজানামায় একস্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন :

"All we see above around
Is but truth on fairy ground;
All we trust is empty shade
To deceive our reason, made,
Tell me not of Paradise
Or the beams of Houries eyes;
who the truth of tales can tell
Cunning priests invent them so well."

(Filzerald)

ওমরের প্রিয় শিষ্য নিজামী লিখিয়াছিলেন : 'আমি ওমরের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি এক রমণীয় উদ্যানের ভিতর বিহার করিতেছিলেন। আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার এমন স্থানে মৃত্যু হইবে, যেখানে মৌসুম-বায়ুর প্রতিপ্রবাহ আমার সমাধির উপর নব নব পুষ্পরাশি বর্ষণ করিবে।" এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমি নেশাপুরে তাঁহার সমাধি দেখিতে যাই।—দেখিলাম এক উদ্যানের পার্শ্বদেশে তাঁহার শেষচিহ্ন সমাহিত রহিয়াছে এবং উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজির শাখাগুলি এরূপভাবে বর্ধিত হইয়া তাঁহার সমাধির উপর ছায়াপাত করিয়াছে যে, দক্ষিণ বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য পত্র ও মুকুলরাশি তাঁহার পবিত্র সমাধির উপর অর্ঘ্যের ন্যায় নিপতিত হইতেছে।' সমাধির প্রস্তর-ফলকে ওমরেরই একটি স্মরণীয় ছত্র লিখিত আছে :

আয় দিল্ চুন্ জমানা মীকুনাদ গমনাকাৎ
নাগাহ্ বেরওয়ান যে-তন্ রুওয়ানে পাকাৎ
বর সব্জা নেশীন ও খোশজী রোজে চন্দ
যাঁ পেশ-কে সব্জা বর দমদ আয খাকাৎ।

কাল নিতি আনে দুখের পশরা
    পরান কখন মেলয়ে পাখা;
দুটো দিন বাটে খুশিতে কাটাও
    না হতে ও-দেহ শ্যামলে ঢাকা।

খ্রিস্টীয় ১১২৪ সনে[১] ওমর খাইয়ামের মোহন মূরলী চিরদিনের জন্য নীরবতা লাভ করে। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্গীতরাশি মূর্তিমতী হইয়া আজো সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। যে উহা শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। ম্যাক্‌কার্থি তাঁহার স্মৃতি লক্ষ করিয়া উচ্ছ্বাসভরে লিখিয়াছেন :

Dear, dear Sultan of the Persian song
Familiar friend whom I loved so long
Whose volumes made my pleasant hiding place
From this fantastic world of right and wrong.
Alas! for me alas! for all who weep
And wonder at the silence dark and deep
That gridless round this little lamp in space
No wise than when Omar fell asleep.

প্রকৃতই, যখন এ পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায়ের কল্পিত বাঁধ আমাদিগকে উৎপীড়িত করে–বিবেক ও সংস্কারের সংঘর্ষে যখন আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়, তখন ওমর খাইয়ামের ফিলোজফিতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হয়। কে জানে সত্যের সন্ধান কোথায়? যে জীবন-সমস্যা ওমরকে বিব্রত করিয়াছিল, আজ পর্যন্ত তো তার কোনো কিনারা হইল না। এই কয়শত বৎসরের জ্ঞানচর্চায় সে বিরাট সমস্যার সমাধানের দিকে একপদও যে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, এমন তো মনে হয় না। সেই আঁধার যুগে, সেই পুঞ্জীভূত অজ্ঞতার বুকের উপর দাঁড়াইয়া নির্ভীক ওমর যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ হৃদয়-বলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাহারো মুখ চাহেন নাই; যাহা বুঝিয়াছেন, ভ্রান্ত হউক, শুদ্ধ হউক, সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—তাই উচ্ছ্বসিত কবিতায় এন্ড্রু ল্যাং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার অর্চনা করিয়াছেন :

"You were a saint of unbelieving days
Liking your life and happy in men's praise
Enough for you the shade beneath the boughs
Enough to watch the wild world or its ways.
Dreadless and hopeless that of Heaven or Hell
Careless of words thou hadst not skill to spell
Contant to know not all thou knowest now
What's Death? Does any pitcher dread the woe!
The Pitchers we whose Maker makes them ill
Shall be torment them if they chance to spill
nay, like the broken potsherds are we cast
Forth, and forgotten and what will be will.
So still were we before the months began
That rounded us and shaped us into man.
So still we shall be surely at the last

---

[১] নিকল্‌সন বলেন, ১১২১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ৫৭৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

Dreamless untouched of blessing or of Ban
Ah! Strange it seems, that this thy common thought
How all things have been, ay, and shall be nought
Was ancient wisdom in thine ancient East
In thouse old days when Selnac fight was fought."

প্রশ্ন হইতে পারে—ওমর কি তবে প্রকৃতই নাস্তিক ছিলেন? এ প্রশ্নের সমাধান অনিশ্চিত, তবে তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে-যে তিনি আল্লাহ্‌র উপর গভীর আস্থা রাখিতেন, তদীয় কবিতার কোনো-কোনো ছত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শাস্ত্রীয় আচার ও ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করিতেন না। শুধু বিশ্বের মূলীভূত এক মহাশক্তির উপাদানই তিনি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন। যখন তাঁহার এই অইসলামীয় আচার-ব্যবহার লোকের দৃষ্টিতে ঘোর অপরাধের কারণ বলিয়া ধার্য হইল তখন তিনি মক্কাধামে প্রস্থান করেন এবং বাগদাদ ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন। আরবেও অনেকে তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ওমর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করায় আরবে তাঁহার মত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ বয়সে ওমর নাকি ধর্মকার্যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। হাফেজের ন্যায় ওমর একস্থলে বলিয়াছেন :

আয় আতশে আখেরাত নমীদারী বাক
দর আবে নাদামত নাত্তদী হরগেজ পাক
চুন্ বাদে আজল্ চেরাগে ওমারাত বোকোশাদ
তরছুম্ কে তুরা যে নানগ না পজিরাদ খাক।

ভরিলে না কভু আখেরি অনল:
তৌওবা বারিতে শুচি না হ'লে;
মরণ ঝঞ্ঝায় নিভিলে দেউটি
বসুধা বুঝিবা লবে না কোলে।

খাইয়াম যে বহ্‌রে গোণাহ্ ই মা'তম চিস্ত
ওয়াজ খোর-দানে গম ফায়দা বেশ ও কম চিস্ত;
আঁরা কে গোণাহ্ না কর্‌দ গোফরান্ না বওয়াদ
গোফরান্ যে বরায়ে গোণাহ্ আমাদ্ ও গমে চিস্ত।

কৃত পাপ স্মরি ওহে খাইয়াম
বক্ষ বিদারি কি ফল বল
অনুশোচনার শত চিৎকারে
রোধিয়াছে কবে করম ফল।
কী লাভ ভাবিয়া: গোফরান খোদা
রয়েছে মজুদ পাপীর তরে
পাপ যদি সখা কেহ না করিবে
গাফফার নাম কেন সে ধরে!

পুন.— ব'রহ্‌মতে তু মান্ আজ গোণাহ্ না আন্দেশম্
ব' তোষায়ে তু যে রঞ্জে রাহ না আন্দেশম্
গর্ লুৎফে তুয়াম সফিদ-রু কর্দায়ান্দ
ইয়াক জার্রা যে জামায়ে সীয়া না আন্দেশম্ ।

পাপ হতে খোদা কি ভয় আমার
অসীম যে তব করুণাধার
পথের সম্বল যা দিয়াছ সাথ
পথক্লেশ, হতে ডরি না আর ।
তোমার কৃপার শুভ্র কিরণ
পরশে বারেক যদি এ কায়,
শুচি হয়ে যাবে সকল কালিমা
তিলেক শঙ্কা নাহিকো তায় ।

গর্ গওহরে তা'তাত না সেফ্‌তাম হরগেজ
ওয়ার গেরদে রাহাত যেরুখ্ না রাফ্‌তাম হরগেজ
নাউম্মেদ নায়েম যে বারগাহে কারামাত
দানী কে ইয়াকে রো দো না গোফ্‌তাম হরগেজ ।

সাধনার মণি কভু খুঁজি নাই,
তব পথে প্রভু রাখিনি শির;
তবু দয়া হতে নাহিকো নিরাশ
এক ভিন্ন দুই মানিনি, স্থির!

রুবাইয়াৎ

প্রাচ্যভূখণ্ডে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াৎ ইউরোপে যেরূপ আদর লাভ করিয়াছে এমন কাহারো গ্রন্থ করে নাই। তত্রত্য প্রায় সমুদয় ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে[১] এবং যখন যে-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে সেই ভাষায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহার লক্ষ লক্ষ সংখ্যা বিক্রীত হইয়াছে।[২] একসময় ওমর খাইয়ামের গ্রন্থপাঠের জন্য ইউরোপে একটি মাদকতা আসিয়াছিল। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমত ইহার ছন্দের লালিত্য ও শব্দবিন্যাসের মাধুর্য সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। দ্বিতীয়ত বিষয়টি সকলেরই একান্ত প্রাণের জিনিস, আর তেমনি প্রাণের ভাষায় উহা গ্রথিত। ইহাতে 'ইউসুফ জোলায়খা'র প্রেমালাপ নাই—'লাইলি মজনু'র প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন নাই—প্রাচ্যদেশীয় চিরন্তন বাঁধা-গতে ঈশ্বরের আরতিও ইহাতে নাই। ইহাতে আছে সেই তথ্য—যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের চিন্তাকে বিব্রত, হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে—সেই তত্ত্ব যাহা পৃথিবীর জন্মকাল হইতে আজ পর্যন্ত কেহ

---

১. ফিজর‍্যান্ড সাহেবের অনুবাদই ইংরাজি অনুবাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ফিজর‍্যান্ড এই এক অনুবাদ দ্বারাই জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন।

২. কথিত আছে একবার ইংলন্ডে একখণ্ড রুবাইয়াৎ দেড় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল।

মীমাংসা করিতে পারে নাই; শত দর্শন, শত বিজ্ঞান যাহার গভীরতার ভিতর আপনাকে হারাইয়া বসিয়াছে। মানুষের পরিণাম—স্বর্গ-নরক—সৃষ্টির উদ্দেশ্য—ন্যায়ের পুরস্কার—অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত—এই সকল জটিল সমস্যা সকলেরই জীবনে একবার-না-একবার উদয় হইয়া মনকে আলোড়িত করে—যতই জীবনের আলো অবসানের পানে অগ্রসর হয়, ততই এই সকল প্রশ্ন ভীষণ হইতে ভীষণতর গুরুত্ব লইয়া মানুষের চিত্তকে নিপীড়িত করে। মানুষ এর একটি সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়। রুবাইয়াতের ভিতর এই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে—একজন মুক্তপ্রাণ সাধকের মরমের মর্মস্থল হইতে।

যে সময়ে রুবাইয়াৎ ইউরোপে প্রচারিত হয়—তখন ইউরোপে ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল।[১] মরণের পর কী হয় এই কঠিন সমস্যার একটি খাঁটি উত্তরের জন্য মানুষ চিরকাল ব্যগ্র। এ প্রশ্নের যেদিন যথার্থ সমাধান হইবে—সেইদিন জগতের ধর্মবিপ্লবের অবসান হইবে। হয় ধর্মের কোনো প্রয়োজন রহিবে না, অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম চিরকালের জন্য অবিসংবাদিতভাবে রাজত্ব করিতে থাকিবে। এই বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব কিছুকাল মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন প্রচলিত ধর্মের আশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ভিতরকার শূন্যতা অনুভব করে তখন দারুণ নৈরাশ্যে তাহার প্রাণ আবার হাহাকার করিয়া উঠে। তাহারই ফলে সময় সময় জগতে পুরাতন ধর্মে মানুষের মনে বিদ্রোহ জাগিয়াছে—যুগে যুগে নাস্তিকতার উদ্ভব হইয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল। আঁধারযুগের পুরোহিতদল জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাকে পঙ্গু করিয়া উহার পৃষ্ঠে ধর্মাদেশ ও আচার-অনুষ্ঠানের এমন গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিল যে তাহার নিস্পেষণে সারা ইউরোপের চিন্তাশক্তি খেপিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহোন্মুখ উন্মত্ততা লইয়া ইউরোপের চিন্তাশীলগণ যখন বিজ্ঞানের চক্ষুদ্বারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল তখন তাহাদের ধারণা হইল পাদ্‌রিদিগের বিরাট-কলেবর গ্রন্থরাজির অধিকাংশ মনগড়া অলীক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তখন খ্রিস্টীয় শাস্ত্রের উপর ও তাহাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলির উপর এক দারুণ অশ্রদ্ধায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ঠিক এইরকম সময় ওমর খাইয়ামের গ্রন্থ ইউরোপে প্রচারিত হয়। যে-কথাটি ইউরোপীয়দের মনের ভিতর গুমরিয়া ফিরিতেছিল—ওমরের সঙ্গীতে তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাইয়া তাহারা উহা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইল।

এশিয়ায় কিন্তু রুবাইয়াৎ তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। আরব্য, পারস্য বা ভারতবর্ষ, এ-সকল দেশের লোক বরাবরই অতীত-পন্থী (Conservative); ইহারা যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহারই পক্ষপাতী; যাহা নতুন—যাহা অপরিচিত—তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তেমন প্রস্তুত নহে। তাই এ-দেশে ওমরের সুরও বোধহয়

---

[১] হিজ হাইনেস্ দি আগা খান বলেন : In the halcyon days of Persia's intellectual renaissance after the Arab conquest, the middle East is said to have produced more poets than the whole medieval Europe but the works of no oriental author have aroused the same degree of interest in the European mind as the modest Rubayat of Omar Khayyam.

The secret of this phenomenon may be traced to Omar's thoughts on the inscrutable problems of life and death being to some extent in Harmony with the rational tendencies by the collision of modern Science with the unquestioning beliefs of a bye-gone age.

শিক্ষিত সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। একবার আবুসিনা ও ইবনে রোশ্‌দ্‌ একধরনের নাস্তিকতার সূচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সে-শক্তি আরবীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলাইতে পারে নাই। চার্বাক ও কণাদ এই ভারতের ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছেন—ভারতের ধর্মবিশ্বাস তাঁহাদের দ্বারা বিচলিত হয় নাই। এই তো সেদিন খসরু ও ফৈজী ইস্পাহান ও আগ্রা হইতে নাস্তিকতার নূতন সুর গাহিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচ্যধর্মের অচল সমুদ্র তাহাতে বিক্ষোভিত হয় নাই। সুতরাং এ-সকল দেশে ওমরের সুর-যে অভিনব আন্দোলনের সূচনা করে নাই তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনোই কারণ নাই। এ-দেশের লোক ওমরের সুরকে নিশীথে শ্রুত-সঙ্গীতের মতো শুধু মাধুর্যের জন্য আদর করিয়াছে কিন্তু উহার সত্যতা তাহাদের হৃদয়ে কোনো অধিকার বিস্তার করে নাই।

ভারতের চার্বাক ও গ্রিসের এপিকিউরাসের দর্শনের সহিত ওমর খাইয়ামের মতের সৌসাদৃশ্য আছে। ওমরের ন্যায় এপিকিউরিয়ানগণও বলেন—

"We are no other than a moving row
Of magic shadow-shapes that come and go
Round with the sun-illumined Lantern held
In midnight by the master of the show"

—Horace

বার্চাকেও এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।'

* * *

মায় খোর কে বজেরে গেল্‌ বহে খাহী খোফ্ত
বে মুজন ও বে হারিফ্‌ ও বেহাম্‌দম্‌ ও জোফ্‌ত!
যেন্‌হার ব'কাহ ম'গো তু-ই-রাজে নেহোফ্‌ত—
হর্‌ লালায়ে পয মোর্‌দা নাখাহান বেশেগোফ্‌ত।[১]

—ওমর খাইয়াম।

কিন্তু এপিকিউরিয়াস ও চার্বাক উভয়েই নাস্তিকতায় ওমরকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন—জড়বাদের শেষ সীমাই তাঁহাদের সীমানা। কিন্তু ওমরের তাহা নহে। তিনি স্রষ্টা স্বীকার করেন কিন্তু পাপপুণ্য স্বীকার করেন না; কেননা তাঁহার মতে মানুষ নিয়তির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র।

---

১. এই বেলা সখা পিয়ে নাও সুরা
ঘুমের তো কাল অনেক পাবে,
কবর গুহায় পচিবে যখন
বান্ধব যেথা কেহ না যাবে।
সব বুলি মিছা; শুনহ গোপনে
একটি বচন সত্য সার—
যে ফুল নিশায় পড়িছে ঝরিয়া
সে নাহি কখনো ফুটিবে আর।

রচনাভঙ্গিতে (Style) ওমরের তুলনা বর্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ। সোজা কথায়, একটি মাত্র শব্দে, একটি মাত্র ইঙ্গিতে পাঠকের মর্মের ভিতর হইতে লুক্কায়িত তারটিকে বাজাইয়া তোলা বোধ হয় অন্য কেহ এমন পারেন না[১]। ফারসি ভাষানভিজ্ঞ বাঙালি পাঠককে কবির রচনাভঙ্গি বুঝাইবার উপায় নাই। বঙ্গভাষায় সে সৌন্দর্য বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

ওমর খাইয়ামের বাণী

আজ আটশত বৎসর অতীত হইল ওমরের বীণা নীরব হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সে সুরের মূর্ছনা, সে ললিত উচ্ছ্বাস, গলিত আবেগ চিরকাল জগৎকে অমৃতের আস্বাদ দিতেছে। কোন্ মর্মভেদী ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ের বিষাদরাশি উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাহার অকাল বিয়োগে তাঁহার হৃদয়ের শতগ্রন্থি শিথিল করিয়া তাঁহাকে সংসারের সকল আশা, সকল উৎসাহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, কে বলিবে? কেন তিনি সারা জগতে কেবল সমাধির প্রস্তরস্তূপ দেখিতেন, হাসিমাখা কুসুমের সুষমা দেখিয়া কেন তাঁহার মনে হইত—কোনো অতীত সুন্দরীর গলিত মস্তিষ্কের উপর উহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে—সে রহস্যের দ্বার কে উদ্‌ঘাটন করিবে? কবির গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে একটি দারুণ অভিমানের সুর সাড়া দিয়া উঠে—কবি যেন প্রকৃতির নির্মম বিধানের প্রতিহিংসা লইবার জন্যই সুরা ও সঙ্গীতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

কোথা আজ সেই এরেমের বাগ
গোলাবে শোভিত কবরী যার,
কোথা গেল সেই 'জামে জমশেদ'
ভুবনে অতুল কীরতি যার!
এখনো দাঁড়ায়ে দ্রাক্ষাবিতান
ছায়াশীতলিয়া নিঝর ধার;
কোথা আজি তাহে অযুত রক্ষী,
আহরি যে ফল পূরিতে ভার!

আজি অতীতের আঁধার গুহায়
নীরবে ঘুমায় দায়ুদ রাজ,
হাজার যুগের জমানো আঁধার
নয়নে তাঁহার পিষিছে আজ।

কবি প্রকৃতির হাসিতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন। কারণ প্রকৃতি একহস্তে সুষমা ছড়াইতেছে, অপর হস্তে ধ্বংসের মহাঅস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। তার এক

---

[১] যেদিন ড. রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ দ্বারা নিজে গৌরবান্বিত হন এবং ভারতবর্ষকেও গৌরবান্বিত করেন, সেই আনন্দের দিনে কোনো মুসলমান অধ্যাপক উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছিলেন—ওমর খাইয়াম বাঁচিয়া থাকিলে আজ পারস্যও এ গৌরব হইতে বঞ্চিত হইত না।

চক্ষুতে হাসি, অন্যটিতে অশনি—

উষার ঝলকে হেসে উঠে যেই
বিকচ কুসুম বিবশ কায়,
তারি পাশে পাশে মৌনব্যথায়
অযুত প্রসূন ঝরিয়া যায়।
যে কর দোলায়ে নব বসন্ত
গোলাবে সাজায় আঁচল তার
সেই করে টুটে কত জম্‌শেদ
কত কোবাদের জীবন-তার!

সুতরা সে-দৃশ্য দেখিয়া আর কাজ নাই। বলিতেছেন, দেখ—

হেথা দূরাকাশে গাহে বুলবুল
লোহিত-মদিরা মহিমা ওই
কিবা সে নিছনি আবেশ রঙ্গিল
লাজময়ী তার গোলাব সই!

অতএব—

এস তবে সখা, সেথায় ওমর,
মদিরা-বিহ্বল বিবশ প্রাণ,
কী কাজ ভাবিয়া খেসরুর যশ,
মুসার মহিমা ঈশার মান;
যেথায় শোভিছে শ্যামল গুল্ম
সুদূর প্রান্তরে কাজল-রেখ,
মানুষে মানুষে ভেদ নাই যেথা,
মনিব ভৃত্য যেখানে এক;
সেইখানে মোরা রচিয়ে আসন
অসীমে নীলিমে মিশাব সুর,
কি ছার তখন শাহ্ মাহ্‌মুদ
কি ছার তাঁহার গজনীপুর!

এইখানে কবির সংসারের প্রতি ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যশ চান না, আড়ম্বর চান না, মহারাজার সঙ্গও তাঁর ভালো লাগে না; তিনি চান—নীরব নিথর শ্যামল প্রান্তর, অথবা কোনো তৃণখচিত উদার নদী-সৈকত। সেখানে তিনি সংসারের সকল বৈষম্য, সকল কৃত্রিম বাঁধ ভুলিয়া প্রাণখোলা মুক্তির আরাম অনুভব করিবেন। সেইখানে হয়তো তাঁহার প্রাণের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হইতে পারে। কবির সে চিকিৎসা-প্রণালী কেমন—

হেথায় গায়ক সনে, এই স্নিগ্ধ গ্লানিহীন তটে,
আমি চাই সাকি আর একপাত্র লোহিত মদিরা;

স্বরগ যদ্যপি থাকে সৃষ্টিমাঝে, এই হবে তাহা
মূর্খ সে, যে নরকের আশঙ্কায় ত্যাজে এ অমরা ।"[১]

পুন.—

ভেশ্‌তে কিংবা জাহান্নামে নাহি জানি উতরিব কোথা
আমি চাই পল্লিমাঠে ওপারে ঐ কুঞ্জবীথিকায়
বেণুরবে সুরাস্পর্শে প্রেয়সীর অলক কুন্তলে
বিকাইতে সেই স্বর্গ ভক্ত যাহা কাম্যরূপে চায় ।[২]

ওই গৃহে হেরিয়াছে শতকোটি ঈশান জনম
ওই তুর শুনিয়াছে শতকোটি মুসার ক্রন্দন
ওই সৌধ জানে কত কাইসারের উত্থান পতন
কী তাহাতে সার্থকতা নিত্য এই হরণ পূরণ ।[৩]

ফারসি কবিদের নিকট সাকির ন্যায় প্রিয় বস্তু জগতে আর নাই । সাকি মদ্য পান করে, সাকি গীত গায়—সাকি তার সুন্দর কিশোর মুখখানির ঢলঢল লালিত্যে কবির চিত্তকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখে—তার কবিত্বের দ্যোতনা দেয় । কবি জনকোলাহলের বহুদূরে মুক্ত প্রান্তরে উদার আকাশের নীচে বসিয়া সাকির উছল সঙ্গীত শুনিবেন—তাঁহার সুরাপানে বিভোর প্রাণ সে উচ্ছ্বসিত গীতি—লহরির তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া নাচিবে, দিগন্তের পারে নীত হইয়া মায়াপুরিতে বিহার করিবে—সে সুখের নিকট সুলতান মাহ্‌মুদের সিংহাসন কি ছার! যারা তেমন রাজত্বকে বাঞ্ছা করে—তারা নিতান্তই কৃপার পাত্র । আর যারা মরণের পর স্বর্গলাভের আশায়—সেই অনাগত সুখের কামনায়, সুখের বর্তমান সুযোগকে উপেক্ষা করে—তাদের মতো ভ্রান্ত আর জগতে নাই । দেখ—

---

১. বা মুতরের ও মায় হূয়ে সেরেশতী গার হাস্ত
বা আবে রওয়ী কেনারে কাশতী গার হাস্ত
বজিন মতলব দোজখে ফরনুদা মতাব
হাক্‌কা কে যুয়্‌ই নিস্ত বেহেশতে গার হাস্ত ।

২. মান হিচ্‌ না দানম কে ম'রা আঁকে সেরেশ্‌ত
করদ আহলে বেহেস্তে খোব ইয়া দোজখে জেশ্‌ত
জামে ও বোতে ও বরবতে বর লবে কেস্ত
ঈ হর্‌ সে ম'রা নকদ ও তোরা নাসিয়া বেহেশত্‌ ।

৩. দায়েরেস্ত কে সদ হাজার ঈশা দীদস্ত
তুরেস্ত কে সদ হাজার মুসা দীদস্ত
কসরেস্ত কে সদ হাজার কাইসার বগোজাস্ত
তা কিস্ত কে সদ হাজার কাহ্‌রা দীদস্ত!

কেহ চায় সদা পরপার সুখ
হুরি কওসর স্বরগপুর
দেখিবে সেসব ঘুচিলে পরদা
অনধিগম্য অতি সুদূর[১]।

* * *

এ ধরা তো সেই পুরনো সরাই
উষা ও গোধূলি তোরণ যার
শত জমসেদ শত বাহ্‌রাম
রেখেছিল যেথা শীরষ-ভার![২]
একদা যেথায় বাহ্‌রাম শা'র
শোভিত বিরাট অলকাপুর,
আজি না সেথায় সুখদ শয়নে
শার্দূল করিছে শান্তিদূর।
কোথা আজি সেই বীর বাহ্‌রাম,
প্রতাপে অতুল আহবে স্থির,
এবে শিবাদল নির্ভয়ে ফিরিছে
দলিয়া তাঁহার কবর শির।[৩]

এই তো মানুষের পরিণাম—এরই জন্য এত গর্ব, এত অহঙ্কার, এত আয়োজন। বৃথা আশা-ভরসা, সব বৃথা। আজ যাহাদের প্রবল পরাক্রমে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, তাহাদেরই মতো কত শত লোক এই পৃথিবীর ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে। কত নেপোলিয়ন, কত সিজারের মস্তক দলিয়া আজ শৃগাল কুকুর নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। ঐ যে গাছটি সতেজে বাড়িতেছে, হয়তো উহার শিকড় কোনো হতভাগ্য মনুষ্যের গলিত মস্তক হইতে রস সংগ্রহ করিতেছে।—

কভু মনে হয় ঐ যে গোলাব
প্রভাত-অরুণে দিতেছে লাজ,
না-জানি কাহার রুধির কণায়
পরিয়াছে উহা অমন সাজ।

---

১. কওমে যে গোজাফ দর গরুর ওফতাদন্দ
ওয়ান্দর তলবে হুর ও কসুর ওফতানন্দ
মা'লুম শওয়াদ চুঁ পর্দ্দাহা বর দারন্দ
আজ কুয়ে তু দূর ও দূর ও দূর ওফতাদন্দ।

২. ই কোহনা রবাতরা কে আলম নামাস্ত
আরাম গাহে আবলাকে সুবেহ্ ও শামাস্ত
বজমেস্ত কে ওয়ামান্দয়ে সদ-জমসেদ আস্ত
গোরেস্ত কে তাকিয়াগাহে সদ বাহরাম আস্ত।

৩. আঁ কসর কে বাহ্‌রাম দার-ও জাম গেরেফ্‌ত
আহু বরাঁ কারাদ ও শের আরাম গেরেফ্‌ত
বাহ্‌রাম কে গোর মী-গেরেফ্‌তী ব'কাশন্দ
দীদই কে চেগুনা গোর বাহ্‌রাম গেরেফ্‌ত!

যে ফুল কোমল, কুন্তলে গাঁথি,
বিহ্বল কানন সুরভি-সার,
প্রতি কলি তার উঠেছে ভেদিয়া
না জানি শিথিল কবরী কার![১]

এই যে শ্যামল সুষমায় ভরা
সুপ্ত শীতল তটিনী ধার,
ধীরে সখা, হেথা চরণ মেলিও,
কিশলয়ে যেন বাজে না ভার!
হয়ত উহারা উঠেছে দলিয়া
কুসুমিত কোনো তরুণী-কায়,
কে জানে তাদের শিকড় কোনো বা
রূপসী অধর পরশি' ধায়।[২]

এই সকল সমাধির দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে কবির মনে মানুষের অন্তিম সময়ের কথা উদিত হইতেছে—কবি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার পরিণাম ভাবিয়া বলিতেছেন :

কেহ বা ব্যাকুল আজিকার লয়ে,
কারো লক্ষ্য দূর, ওই পরপার
নিঠুর মরণ কহিছে ফুকারি—
কোথাও কিছু নাহিকো সার![৩]

বিধি-বিধানের অলীক ভয়েতে
থেকো না জড় এ ফাগুন দিনে
আয় বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা
হে সাকি, অধীর পেয়ালা বিনে।[৪]

---

১. হর্‌জা গোলে ও লালা-জারী বুদাস্ত
আজ সর্‌কীয়ে খুনে শহর ইয়ারে বুদাস্ত
হর বর্গে বনক্‌শা কাজ জমী মী রুইয়াদ
খালীস্ত কে বর রোখে নেগারে বুদাস্ত।

২. হর সব্‌জা কে দর কেনারে জোয়ে রাস্তাস্ত
গোয়ী যে লবে ফেরেশ্‌তা খোয়ী রাস্তাস্ত
হাঁ বর্‌ সরে সবজা পা বখারী না নানেহ
কাঁ সব্‌জা ব'খাকে লালা-রুই রাস্তাস্ত।

৩. কওমে মতাফক্কর আন্দ দর মজ্‌হাব ও দীন
জম'এ মতাহাইয়ার আন্দ দর সফ্‌ ও ইয়াকীন
নাগাহে মনাদী বর আইয়াদ যে কমীন
কায় বেখ্‌বরা বাহ্‌না আনাস্ত ওনা ই।

৪. ই কাফেলায়ে ওমর আজব মী গোজারাদ
দয় ইয়ার দমে কে আজ তরব মী গোজারাদ।
সাকী গমে ফারদায়ে হারিফান চে খোরী
পেশ আর পেয়ালারা কে শব মী গোজারাদ

তারা বলে সুখ স্বর্গের হূরে
আমি বলি সুখ মদিরে বঁধু
বাকি ত্যাজি লহ্ নগদ যা পাও
দূরের ঢোলক শুনিতে মধু ।[১]

এ চাঁদ কিরণে মধু লুটো আজ
কালি নিশীতের ভরসা কই
চাঁদনী হাসিবে যুগ যুগ ধরি
আমরা তো আর রব না সই![২]

ঢালো সুরা আজ পিয়াসা থাকিতে
জীবন অথির পারদ প্রায়;
উঠ সখি এই জাগরণ-যোগে,
যৌবন ত্বরা নিভিয়া যায়![৩]

কবির মতে মানুষ অদৃষ্টের করে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। সে তো সম্পূর্ণ নিরুপায়—তার আবার পাপ-পুণ্য কী? কবির কথাটিই এন্ড্রুু ল্যাং প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন—

> The pitchers we whose Maker makes them ill,
> Shall he torment them if they chance to spill?

রুবাইয়াতের শেষভাগের নাম কূজানামা। কূজানামাতে কবি এই শেষোক্ত কথাটিই কুম্ভকার ও ঘটের উদাহরণ দ্বারা ভালোরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নানা ভাবে, নানা ছন্দে অদৃষ্টের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া কবি বিশ্ববাসীকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে জীবনকে মধুময় করিতে বলিয়াছেন।

---

১. গোইয়ান্দ ম'রা চুঁ সুর বা হুর খোশ আস্ত
মান্‌মী গোফ্‌ত কে আবে আঙ্গুর খোশ আস্ত
ই নকদ বেগীর ও দস্ত আজাঁ নসিয়া বেদার
কে আওয়াজে দহল শনিদন্‌ আজ দূর খোস আস্ত

২. চুঁ ওহদা নমী শওয়াদ কাছে ফারদা রা
হালে খোশ কোনো ই দেলে পোর সওদারা
মায় নোশ বনুরে মাহ আয় মাহ কে মাহে
বেসিয়ার বেতাবাদ ও নেইয়াবাদ মা'রা।

৩. মায় দর কফে মান নেহ কে দেলম্‌ দর তাবাস্ত
ও ই ওম্‌রে গোজিন পায়ে চুঁ সীমাব আস্ত
বর্‌খেজ কে বেদারীয়ে দৌলতে খাবাস্ত
দর ইয়াব কে আতশে জোওয়ানী আব আস্ত।

ওমর খাইয়ামের ধর্ম

মানুষের ভিতর চিরকালই পরস্পরের সহিত প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য হেতুই একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীও এই কারণেই বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। একই পরিবারের সন্তানদিগের ভিতর একই অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মনোবৃত্তিতে সমূহ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শুধু-যে দৈনন্দিন জীবনেই মানুষের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় এমন নহে, পৃথিবীর যে-সকল জটিলতম রহস্যের সহিত মানবের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে সে-সকলের মীমাংসাতেও ইহার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। আত্মা কী, ব্রহ্ম কী, জগতের আদি কারণ কী, আত্মা ও ব্রহ্মে কী সম্পর্ক—এ সমস্ত বিষয়ে আস্তিক যে-ধারণা পোষণ করে, নাস্তিক তাহা করে না। বৈজ্ঞানিক যে-বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছে, সরল বিশ্বাসী ভাবুকের বিশ্বাস তদ্রূপ নহে। অথচ যাহারই একটু চিন্তাশক্তি আছে সেই কোনো-না-কোনো প্রকার মীমাংসায় আস্থা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারের একটি বিরাট সত্তাকে জগতের এবং তথা নিজের, কারণ-স্বরূপ ধরিয়া লইয়া তবে নিশ্চিন্ত আছে। কেহই নিজের ক্ষুদ্র আত্মশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকিতে পারে না। এই-যে আপনার অপেক্ষা বৃহত্তর কোনো সত্তাকে অবলম্বন স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ ও তাহাতে নির্ভর স্থাপন করা—ইহাই মানুষের অন্তরের ধর্ম। বাহিরের লোকাচরিত ধর্ম এই গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্থূল সৃষ্টিমাত্র। বাহিরের স্থূল ধর্মকে বর্জন করিয়া লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিন্তু অন্তরের মূল বিশ্বাসকে বর্জন করিয়া কেহই বাঁচিতে পারে না। এই বিশ্বাসই মেরুদণ্ড স্বরূপ মানুষের জীবনের সকল কার্যকে সংবদ্ধ করিয়া উহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া থাকে। শোপেন্‌হর বলিয়াছেন—Faith makes the universe.

ওমর খাইয়াম বাহিরের ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার অন্তরের ধর্ম কী, ভালো করিয়া 'পরখ' করিতে হইবে। এই-যে তাঁহার দারুণ নৈরাশ্যের বেদনাগীতি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই-যে তাঁহার সমরায়োজন; ভোগের ভিতর দিয়া, গীতি-কাকলি ও মদিরার ভিতর দিয়া, বিশ্বের অনৃত কোলাহলকে ডুবাইয়া দিবার এই-যে সুদৃঢ় সংকল্প; ইহার মূলে অবশ্য কোনো নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। কোনো সনাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবির এই অভিমান চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। বিশ্ববাসীর প্রাণে উহার সুর এমন করিয়া এক চিরন্তন ঝঙ্কার তুলিতে পারিত না। কবির হৃদয় সত্যের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন না হইলে পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের প্রতি মানবের আবহমানকাল প্রচলিত আস্থাকে এড়াইয়া কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

কবির হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কোন্ ধর্ম লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির লিখিত কাব্যই এ-বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবে। কারণ; ছন্দ ও গানের ভিতর দিয়া কবির যে-বাণী বাহিরে প্রকাশিত হয় উহা কবির অন্তরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু সে-কথার আলোচনা করিতে হইলে মানুষের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক।

এই-যে মানব ও তাহার পরিপার্শ্বে হাসিকান্নাময় জগৎ, এ দুইয়ের অন্তরালে একটি প্রচ্ছন্ন অনির্বচনীয় জগৎ বিরাজ করিতেছে। মানুষ তাহার জৈবদেহে নানাপ্রকারে সীমাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই বন্দিদশার ভিতর হইতে বহির্জগতের সহিত

পরিচয় করিতে মানুষের মনে তিনটিমাত্র বৃত্তি আছে—জ্ঞানবৃত্তি, ভাববৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি। এই তিনটি ভিন্ন আর কোনো পথ উন্মুক্ত নাই যাহা দ্বারা মন তাহার বন্দি-কারা হইতে বাহিরের সন্ধান লইতে পারে। মানুষ যখন তাহার কোনো-না-কোনো বৃত্তিদ্বারা প্রকৃতি বা নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা করে তখন সে যতই গভীরতর প্রবেশ করে ততই অনির্বচনীয় জগতের সান্নিধ্যলাভে অধীর হইয়া উঠে। তারপর অবশেষে সে আর অগ্রসর হইতে পারে না, তাহার হৃদয় অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই মায়াজগতের দ্বারদেশে আপনার অজ্ঞাতসারে আবিষ্টের ন্যায় ঢলিয়া পড়ে। সে জগতে কী আছে কেহ জানে না, কেহই উহা কখনো দেখিতে পায় নাই; তাই তার নাম অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, অনাদি-অনন্ত। আমি জ্ঞানের পথে প্রকৃতিকে বুঝিতে যাই, দেখি বিরাট অভ্রভেদী হিমাচল আপন মহিমায় দণ্ডায়মান; শৃঙ্গ তার সুদূর শূন্যের অস্পষ্টতায় মিলিয়া গিয়াছে। তার উর্ধ্বে উদার নীলিমার চন্দ্রাতপ, সীমাহীন, অন্তহীন, কী-জানি কেমন; তারপর—আর তো ভাবিতে পারি না! চিন্তাশক্তি যে অবশ হইয়া আসিতেছে! এইখানেই এক অনির্বচনীয়তার ভূমা অনুভূতি আমার হৃদয়কে ছাইয়া ফেলিল।

বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র লইয়া একবার প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করি। লৌহকে চূর্ণীকৃত করিয়া, প্রস্তরকে নিষ্পেষিত করিয়া; মৃত্তিকার অণু, বৃক্ষের অংশ, সবকিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই, একরাশি পরমাণুর স্তূপ। তারপর তাকে আরো বিশ্লেষণ করি, দেখিতে পাই এক-একটি পরমাণু কে কোথায় মিলিয়া যায়—কাহারো সন্ধান পাই না! বিজ্ঞান এখনো এমন যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারে নাই যাহা দ্বারা সে পরমাণুর স্বরূপ দর্শন করিতে পারে। আমি স্থির জানি, পরমাণু আছে—কিন্তু সে কী বা কেমন, তাহা তো বলিতে পারি না। আমি বুঝিতেছি, এই বিরাট বসুধা ঐ সকল রূপহীন পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু জানি না কিসে কী হইয়া এমনটি হইল; এইখানেই আমার সম্মুখে অনির্বচনীয় জগৎ প্রসারিত হইয়া আমার জ্ঞানশক্তিকে প্রতিহত করিতেছে।

ভাবের দ্বারা সৃষ্টিকে বুঝিতে চেষ্টা করি। দেখিতে পাই, ঐযে আকাশের গায়ে উষার কনক-রেখা নিতি নিতি কত ছবি আঁকিয়া যায়, ঐযে সান্ধ্যগগনে অযুত-কোটি নক্ষত্র ফুটিয়া-ফুটিয়া নিভিয়া যায়—এ সকলের অর্থ কী? এ সকলের সহিত আমাদের হৃদয়েরই বা সংযোগ কোথায়? কেন তাদের আবির্ভাবে আমার হৃদয়ে শত-ভাবে খেলা খেলিয়া যায় কেহ বলিতে পারিবে কি? ফুলটি কেন ফুটে, যে ফুটায় তার সুখ কী, সে প্রশ্নের সমাধানে শুধু কি একা কপালকুণ্ডলাই বিব্রতা হইয়াছিল! কণ্টকময় গোলাপ-শাখার ছোট্ট ঐ কুঁড়িটিতে অমন কমনীয়তা কোথা হইতে আসিল, আবার কোন্ দেশেই-বা সে সুষমা চলিয়া যাইবে, কী উহার ভাষা, কী উহার ইতিহাস, কিছুই তো বুঝিতে পারি না। ধারণাশক্তি যে আর অগ্রসর হয় না! মন যে বিহ্বল হইয়া আসিতেছে; আমি মৌন হইয়া শুধু ভাবিতেছি আর এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আমার হৃদয় বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে! আবার ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা কর্মের ভিতর দিয়া যখন প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তখন দেখিতে পাই, আমাপেক্ষা কত সহস্রগুণ প্রচণ্ড শক্তি এই বিশাল বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গর্জিয়া ফিরিতেছে ও প্রতিপদে আমার শক্তির ন্যূনতা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সে শক্তির কোনো নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই; উহা বহুরূপী, উহা অসীম, উহা অনির্বচনীয়; মনোরাজ্যের ভিতর অনুসন্ধান কর, দেখিবে সুখদুঃখের নানা অনুভূতির মেলা। তারও অতীতে, গভীরতম প্রদেশে এক অব্যক্ত নির্বেদ চেতনা যেন ঘুমন্ত

রহিয়াছে; সে একটি সংজ্ঞামাত্র, তাহাকে বোধ করি, কিন্তু তার কোনো বিশিষ্ট অনুভূতি হয় না। সে যেমন কেমন-কী! এই অনির্বচনীয় সত্তাকে ধরিতে গিয়া আমরা নিজেকেই হারাইয়া বসি; নিজের সত্তা বা উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া উহারই লোভনীয় স্পর্শে এলাইয়া পড়ি, উহার ভাবে তন্ময় হইয়া মূঢ় হইয়া থাকি।

এই অনির্বচনীয়, যাহাকে তুমি খোদা বা ব্রহ্ম বা জিহোবা ইত্যাদি যা-ইচ্ছা তাই বলিয়া যুগ-যুগ ধরিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছ, উহাকে জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করিতে গেলে উহা সত্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়; ভাবের দ্বারা উহাকে অনুভব করিতে চাহিলে উহা আনন্দরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, আর কর্মের দ্বারা তাহাতে উপগত হইতে গেলে উহা মঙ্গলরূপে আমাদিগকে চরিতার্থ করে। কিন্তু যে যেভাবেই তাহাতে উত্তীর্ণ হউক, মোক্ষফল লাভ করিলে দেখে সকলে একই মন্দিরে উপনীত হইয়াছে। যিনি সত্য, তিনিই সুন্দর, তিনিই শিব বা মঙ্গল!

সাধনার এই তিনটি মার্গ পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। কিন্তু ইহারা সকলেই সমান সুগম নহে। ভক্ত রামপ্রসাদ ব্রহ্মকে জানিবার জন্য কোনো প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞানের প্রতীক্ষা করেন নাই; ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া অতি বিপুল আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাকবি হাফেজও তাই। হাফেজ পরম পণ্ডিত-লোক ছিলেন; কিন্তু জ্ঞানমার্গ না ধরিয়া ভাবমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবন প্রেমাস্পদের বাসরশয্যায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ওমর খাইয়াম ধরিয়াছিলেন জ্ঞানমার্গ। হাফেজ বিচারবুদ্ধির প্রতীক্ষা রাখেন নাই, তাই তিনি সন্দেহের দোলায় কখনো দুলিত হন নাই; বিশ্বসৌন্দর্যের ভিতর দিয়া একেবারেই অনির্বচনীয়ের আনন্দ-স্বরূপে উপনীত হইয়াছিলেন। তাই হাফেজের ভিতর নৈরাশ্যের হাহুতাশ নাই, আছে শুধু মিলন ও বিয়োগের মর্মোচ্ছ্বাস। কিন্তু ওমর ছিলেন সত্যের রাজ্যে, তাই আনন্দের পূর্ণ-পশরা সহসা তাঁহার নিকটে পৌঁছে নাই। উৎসব-বাটীর পবন-বাহিত সুরভী যেমন প্রতিবেশীকে আকুলিত করে, অনির্বচনীয়ের আনন্দ-স্বরূপও তেমনি তাঁহাকে বাহির হইতে আকুলিত করিয়াছিল। তাই তাঁহার এত আনন্দ-তৃষ্ণা, এত ভোগ-চরিতার্থ তার কামনা। অন্তরে তিনি যে-আনন্দজগতের পরিকল্পনা করিতেন, সে কল্পিত নন্দনকাননের সন্ধান তো বাস্তবজগতে মিলিত না। তাহার তুলনায় এ জগৎ যে অনেক অসম্পূর্ণতায় দূষিত, অনেক নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার-অবিচারে ভরা। এখানে ওমর তৃপ্তিলাভ করিবেন কী করিয়া! ভাবুক যেমন অপূর্ণকে ভাবের বেষ্টনীতে ফেলিয়া পূর্ণভাবে দেখিতে পারেন, পাপের পশ্চাতে ভীষণ পারলৌকিক দণ্ড পরিকল্পনা করিয়া এক সুন্দর সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতে পারেন, ক্ষুব্ধ অত্যাচারিতের জন্য মনে মনে এক চিরন্তন সুখের মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন সত্যদর্শী বাস্তবতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জগৎকে তেমনভাবে দেখিতে পারেন না। পাপ-অবিচার দর্শনে তাঁহার অন্তরে মর্মদাহ উপস্থিত হয়, তাঁহার ঔষধ তিনি কোথাও খুঁজিয়া পান না। অতি প্রিয় কামনার ব্যর্থতায় তিনি যে-নৈরাশ্য অনুভব করেন, তাহার শান্তি এ জগতে কোথায় মিলিবে? অনাথিনী মাতার একমাত্র আশার স্থল পুত্র যখন মাতাকে ফেলিয়া জন্মের মতো চলিয়া যায়, সরলা বালিকার অকলঙ্ক সিঁথির সিন্দুর যখন অকারণে চিরদিনের মতো মুছিয়া যায়, আর পাপ মানুষের মূর্তি ধরিয়া যখন তাহাদের নারীধর্মের উপর মর্মভেদী অত্যাচার করে, তখন সত্যদর্শীর একান্তই বিশ্বাস হয় যে জগৎ ন্যায়ের রাজ্য নহে,

এখানে পাপ-পুণ্য কিছু নাই, আছে শুধু শক্তির লীলাভিনয় মাত্র। দুর্বলের বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া সবল যখন তার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, তখন সত্যদর্শীর নৈরাশ্য আরও বর্ধিত হয়। এইরূপে জগতের সকল মানুষ যখন একে-একে সত্যদর্শীর নয়নে পতিত হয়, তখন তাহার অন্তর একেবারেই জগতের নৃততায় আস্থাহীন হইয়া উঠে। সে তখন কর্মপথেও আর অগ্রসর হয় না। কেননা আশাই লোককে কর্মে প্রেরণা দেয়। এইরূপে ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গ উভয়ই তাহার পক্ষে রুদ্ধ-সোপানে পরিণত হয়। তখন সে আর জগৎ হইতে বা সমাজ হইতে কোনো সুখের আশা করে না। সে চায় লোকালয় ছাড়িয়া দূরে দূরে গহন কাননে, নদী-সৈকতে তাহার মনের ভিতরকার সেই আনন্দপুরির সন্ধান করিতে। আনন্দের কাঙাল হইয়া সে পথে-পথে কাঁদিয়া ফেরে। কখনো আনন্দের অধিকারী অনির্বচনীয়ের উদ্দেশে আবাহন-গীতি গায়, কখনোবা তাঁহার নিষ্ঠুর বধিরতায় ব্যথিত হইয়া সুরা-গীতি ও নারী-সৌন্দর্যের তন্ময়তায় আপনাকে ডুবাইয়া দিতে অন্তত মুহূর্তের জন্য হৃদয়ের ক্ষত ভুলিয়া থাকিতে চায়। এ চাওয়া নয়; এ তাঁহার চিত্তের নিবেশ নয়, বিক্ষেপ মাত্র।[১] ওমরের সমগ্র রুবাইয়াৎ তাঁহার একটি প্রয়াসের, একটি আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস মাত্র। সে প্রয়াস তাঁহার সত্য হইতে আনন্দে পৌঁছার প্রয়াস। সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি জগৎ হইতে নিরাশ হইয়াছেন, কোথাও একটু আনন্দের আস্বাদ পান নাই। অথচ তিনি আনন্দের শেষ উৎস চিন্ময়ের সমীপবর্তী। তাই কবিহৃদয়ের সকল কপাট খুলিয়া একবার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। কোথাও উহা আশার স্নিগ্ধ-ললিত-পদাবলিতে ব্যক্ত হইয়াছে; কোথাও ব্যর্থতার ক্ষোভে উহা ঘোর বিদ্রোহ ভাবের ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু সকল ব্যথার মূলে রহিয়াছে এক জ্বলন্ত তৃষ্ণা শাশ্বত আনন্দবারি পানের জন্য।[২]

---

১. ওমর খৈয়ামের মূল ফারসি রুবাইয়াতে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় ভাবের পদাবলিই একত্র সংমিশ্রিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শুধু নাস্তিকতামূলক পদগুলিই সংকলিত করিয়া একটা সুবিন্যস্ত সংবদ্ধ কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু মূল কাব্য এমন সুসংবদ্ধ হইবার কথা নহে। কেননা উহা এক সময়ের বা এককালীন রচনা নহে। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কবিহৃদয়ের যে অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহারই সমষ্টি তাঁহার রুবাইয়াতের সৃষ্টি করিয়াছে।

২. Immediately before his death he was reading in the 'Shifa' of Avicenna the chapter trecating of the One and the Many, and his last words were: 'O God, verily I have striven to know Thee according to the range of my powers, therefore me; for, indeed such knowledge of Thee as I possess in my (only) means of approach to Thee'.–Literary History of Parsia by E. G. Browne–P. 251.

শেখ সাদি

একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোনো আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন—বাল্যবন্ধু শেখ সাদির দ্বারা যেন তাঁহার জীবনের শেষ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। দেখিতে দেখিতে একদিন তাঁহার জীবনের কৃষ্ণসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ব্যথিতের আর্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দকুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল! সেইদিন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার সেই অন্তিম অনুরোধটি স্মরণ করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শাহানশাহ সম্রাট ও দীনহীন প্রজা যে-ভবনে একই মূল্য বহন করে, বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দার ও আশ্রয়হীন কাঙাল যেখানে একই সজ্জায় নীত হয়, সেই গৃহ সাধুর জন্য নির্মিত হইল। কিন্তু শেখ সাদির সন্ধান আজ কোথায় মিলিবে? ছয় মাসের পথ সিরাজনগরে এ মৃতের আকুল কামনা করে পৌঁছিবে, কবে সে প্রতিশ্রুত পথিকের আকাঙ্ক্ষিত আগমন সূচিত হইবে? এতদিন কি তাঁহারই পথপানে চাহিয়া এ দেহ এমনই করিয়া সমাধির দ্বারে পচিতে থাকিবে? জগৎ যে আর তাঁহাকে চায় না, পৃথিবীর পৃষ্ঠে আর তাঁহার স্থান কোথায়? সমাজের লোক তাঁহাকে ধরণীর বুকে লুকাইয়া রাখিতে অগ্রসর হইল। কোনো স্থান হইতে কাহারো অশ্রুভরা করুণ আঁখি ঐ অস্তায়মান মুখখানি লক্ষ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে কি না, তাহাও তাহাদের ভাবিবার অবসর হইল না। সাধুর শেষ ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া, শোকাচ্ছন্ন পরিবারের মর্মবেদনা স্তব্ধ করিয়া, সকলে অগত্যা সেই মৃতের 'জানাজা' (মৃতাত্মার কল্যাণার্থ নমাজ) পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বর্গভ্রষ্ট শিশু মর্ত্যের মাটিতে খেলিতে খেলিতে ধূলিমাখা দেহে আজ গৃহে ফিরিল; তাই সেখানে তাঁহার মার্জনার জন্য বন্ধুগণের এই আকুল কামনার অভিনয়! প্রার্থনা আরম্ভ হইয়াছে, কেহ বিধাতার নাম করিতেছে, কেহ বা মনে মনে বলিতেছে—আহা! সাদি যদি এখন আসিতেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত যায়, আর ক্রমেই সাধুর শিষ্যদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠে। এমন সময় সহসা কাহার দূরাগত কণ্ঠের মর্মস্পর্শী বাণী সকলের কর্ণগোচর হইল! দেখা গেল—এক শুক্লাম্বর শ্বেতশ্মশ্রু-বিলম্বিত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; মস্তকে শ্বেতোজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, হস্তে রজত শুভ্র যষ্টি, নয়নে স্বর্গের বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপ্রভা। প্রাণের উৎসারিত বেদনারাশি জমিয়া যেন তাঁহার বদনের সৌম্যতাকে অধিকতর নিবিড় করিয়া দিয়াছে। সে তেজঃপুঞ্জ মূর্তি যে দেখিল তাহারই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল ও মস্তক আপনাআপনি তাঁহার পাদমূলে আনত হইয়া আসিল। সাদি বিনয়ে কহিলেন—বন্ধুগণ, পবিত্র দেহের শেষ ক্রিয়া সাধনার্থ ছয়মাস পূর্বে আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি, তাহারই সৎকার হইতে আমার বহু বর্ষের লালিত আকাঙ্ক্ষাকে আজ ব্যর্থ করিয়া দিও না। আজ আমি বাল্য-প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া ঋণমুক্ত হইবার জন্য এই তীর্থভূমিতে ছুটিয়া আসিয়াছি।[১]

---

[১] কথিত আছে, ইহারা দুই বন্ধু পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে যাঁহার পূর্বে মৃত্যু হইবে, অন্যে আসিয়া তাঁহার 'জানাজা' পাঠ করিবেন। সাদি ধ্যানযোগে বন্ধুর মরণের-দিন পূর্বেই জানিতে পারিয়া তদনুসারে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আকাশের উদারতা ও স্বর্গের শান্তি লইয়া সময় সময় যে-সকল মহাপুরুষ মর্ত্যের দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করেন ও জগতের কিঞ্চিৎ যথার্থ কল্যাণ সাধন দ্বারা মানুষের স্মৃতিপটে অক্ষয় পদচিহ্ন রাখিয়া যান, মহাত্মা সাদি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মুদ্রাযন্ত্র বা ডাকপ্রথার যখন সৃষ্টি হয় নাই, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ ও পত্রিকার অবাধ প্রচার দূরের কথা—সামান্য একখণ্ড লিপিকাও যখন লোক মারফৎ স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না—সাহিত্য, ধর্মনীতি বা ইতিহাসের অভিনব বার্তা যখন দেশের জনসাধারণের গৃহে গৃহে পৌঁছিবার কোনো সুযোগ না পাইয়া শুধু কতিপয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিত, তখন সাদি নৈশ-নক্ষত্রের মতো আপন অনাড়ম্বর কিরণধারা উৎসারিত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে সে আলোকরাশি উপহার দিতেন। বাষ্পীয় শকট যখন পথের দৈর্ঘ্য চূর্ণ করিয়া লোকের বিদেশ-যাত্রা এমন সুখকর ও শঙ্কাহীন করিয়া দেয় নাই, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা পদব্রজে ভিন্ন যখন মরুভূমি বা গিরিবর্ত্ম লঙ্ঘনের উপায় ছিল না, তখন সাদি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী ও অসভ্য বর্বর-অধ্যুষিত জনপদের সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া কেবল জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার মানসে জগতের বিভিন্ন দেশে বিচরণ করিয়াছেন এবং নানা স্থানে সদনুষ্ঠান ও উপদেশ বিতরণ দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ধর্ম ও সভ্যতার পথে উন্নীত করিয়াছেন। আবার আত্মার রাজ্যে (spiritual world) যোগবল ও তপস্যাতেও তাঁহার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সাধক শুধু পারস্যে কেন, সমগ্র মুসলমান জগতে একান্ত বিরল।

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে[১] পারস্যের অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ সিরাজনগরে সাদির জন্ম হয়। সিরাজে জন্ম বলিয়া তাঁহার এক উপাধি 'সিরাজী'—বাল্যনাম শেখ মোসলেহ উদ্দীন। সিরাজনগর ফারেস প্রদেশের অন্তর্গত। সাদির যখন জন্ম হয়, তখন সুপ্রসিদ্ধ 'আতাবগ সা'দ বেন জঙ্গী' ফারেসের শাসনকর্তা ছিলেন। সাদির পিতা ইঁহারই রাজসরকারে চাকরি করিতেন। সাদিও পরিণত বয়সে দীর্ঘকাল ইঁহার সভাস্থলে বৃত্তিভোগী রাজকবি ছিলেন। 'সাদি' শব্দ 'সা'দ' হইতে গৃহীত উপাধিমাত্র।

সাদি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল প্রধানত তিন অংশে বিভক্ত—তাঁহার প্রথম ত্রিশ বৎসর শৈশব ও ছাত্রজীবন, তৎপর ত্রিশ বৎসর দেশভ্রমণ এবং অবশিষ্ট কাল তিনি তপস্যা ও নির্জন উপাসনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। শৈশবেই সাদির অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় শৈশবে তাঁহার বিদ্যালাভের তেমন সুযোগ ঘটে নাই। পিতৃহীন সাদি নিরুপায় হইয়া এক সদাশয় ওমরাহের শরণাপন্ন হন এবং কিছুকাল ইঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়া পরে বিদ্যাশিক্ষার্থে বাগদাদ নগরে প্রস্থান করেন।[২]

এই সময়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাগদাদ নগরীই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। সাদি দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক কষ্টে পদব্রজে এই বাগদাদ

---

১. সাদির জন্ম ও আয়ুষ্কাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—সাদি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১০২ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনেকে আবার ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাদির জন্ম নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে সাদি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। দৌলত শাহ্ প্রথমোক্ত আয়ুষ্কাল সমর্থন করেন; স্যার আউস্‌লি দ্বিতীয়টি। আমরা বিশেষ কারণে শেষোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছি।

২. কেহ কেহ বলেন সম্রাট সা'দ স্বয়ংই এই পিতৃহীন বালকের আশ্রয় দান ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নগরে উপনীত হন। কিন্তু এখানে আসিয়াও সহসা তাঁহার দুঃখের অবসান হইল না। আশ্রয় অভাবে অনেক দিন তাঁহাকে পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল। তাঁহার পর তিনি এক সহৃদয় বণিকের অনুকম্পা লাভে সমর্থ হন। কত চিন্তাক্লিষ্ট দিবা, কত বিষাদময়ী রজনীর অবসানের পর একদা এক সুন্দর প্রভাতে এই ধনাঢ্যের করুণা আসিয়া তাঁহাকে নিষিক্ত করিল। ইহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারই অনুগ্রহে সাদি বাগদাদের এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। বহুদিনের যে জ্ঞানপিপাসা তাঁহার প্রাণের ভিতর সকল বৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া দৈত্যের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এত দিনে তাহার পরিতৃপ্তির সুযোগ আসিল। খোদা বোধহয় মহাপুরুষদের জীবন এইরূপেই দুঃখ-দৈন্যের ভিতর দিয়া ঘাত-সহ করিয়া তুলেন। বিগত শতাব্দীতে বঙ্গদেশের একজন কর্মবীরেরও প্রথম জীবন এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।[১] নূতন স্থান বাগদাদে আসিয়া সাদি যে অসাধারণ পরিশ্রম ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিলেন, তাহাতে শীঘ্রই তাঁহার উপর তদীয় শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা এই অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রবাসী বালকের প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আশাতীত স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

মহানগরী বাগদাদ যে শুধু শিক্ষার দিক দিয়াই বড় কেন্দ্র ছিল তাহা নহে, কবিপ্রতিভার উন্মেষের পক্ষে ইহার ন্যায় উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে অতি বিরল। 'পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, এক দৃশ্য শ্মশান'—এই দুয়ের ন্যায় অন্য কিছুই মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। এ বিষয়ে শেষোক্তটির প্রভাবই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাদি যখন বাগদাদে তখন বাগদাদের অবস্থাও অনেকটা শ্মশানেরই অনুরূপ। বাগদাদের গৌরবের দিন তখন চলিয়া গিয়াছে। হারুন-অর-রশিদের রঙ্গমঞ্চ, আল্-মামুনের বিদ্বৎসভা সকলই তখন অতীত স্মৃতিতে পরিণত। প্রভাতের সহস্র দামামা তখনো তথায় সমস্বরে বাজিত, কিন্তু ইহাতে বাগদাদের বলদৃপ্ত রাজশক্তির অতীত মহিমা আর বিঘোষিত হইত না। অযুত গায়িকার কলকণ্ঠ তখনো ঝঙ্কার দিত, কিন্তু ইহা পূর্বের ন্যায় আর তেমন করিয়া বাগদাদের নাট্যমন্দির মুখরিত করিত না। যে ক্ষীণহস্তে তখন বাগদাদের রাজদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল, তাহাতে হারুন-অর-রশিদের বংশের গৌরব দিনদিন মলিন হইয়া আসিতেছিল। এই প্রাচীন মহানগরীর অসংখ্য উদ্যানরাজি ও অদূরবর্তী স্রোতস্বতী যেমন একদিকে দর্শকের মন অপার আনন্দরসে আপ্লুত করিত, তেমনি উহার অগণিত ভগ্নসৌধ ও অসংখ্য নীরব সমাধি তাহাকে অনন্ত অতীতের কুহেলিকার ভিতর আত্মহারা করিয়া দিত। কত শাহী গোরস্থান, কত পীরের আস্তানা যে এই মহানগরীকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মহানগরীর স্মৃতি একদিন মহাকবি টেনিসনকেও পাগল করিয়াছিল।[২] মহাকবি সাদিরও কবিপ্রতিভা এই পুণ্যতীর্থে প্রথম উন্মেষিত হয়।

সাদি যখন কবিতাচর্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। এই সময় বাগদাদের প্রধান বিদ্যালয় 'নিজামিয়া মাদরাসায়' একজন অতি প্রতিপত্তিশালী অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম আবুল ফাতাহ্ বিন্ জুজী। সাদি একদিন একটি কবিতাতেই তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি তদবধি সাদির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন এবং তাঁহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সাদি নিজামিয়া মাদরাসায় প্রবেশ লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। কিন্তু সাদি তখন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন

---

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২. Dream of the Arabian Nights কবিতা দ্রষ্টব্য।

না। আরো একটি নূতন রাজ্যে প্রবেশের জন্য তাঁহার চিত্ত তখন প্রভাবিত হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পূর্বেই বাগদাদের গৌরবমণি তাপসশ্রেষ্ঠ শেখ আবদুল কাদের জিলানীর অলৌকিক তপঃপ্রভাবের কথা আরবের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১] সাদি অবসর সময় সিদ্ধপুরুষদের আশ্রম গিয়া অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্য সংগ্রহ করিতেন। পরিশেষে তিনি মহর্ষি শেখ শাহাবউদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দীর নিকট মুরিদ হন এবং সুফিসাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সাদির ধর্মগতপ্রাণ তত্ত্বজ্ঞান ও পুণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাগদাদে তখন তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সে সাদি নিজামিয়া বিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া 'মওলানা' উপাধি লাভ করেন।

এই সময় বাগদাদে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। যে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খাঁর নামে আজিও সমগ্র এশিয়ার লোক শিহরিয়া উঠে, তাহারই পৌত্র নৃশংস হালাকু খান এই সময় এক বিরাট তাতার-বাহিনী লইয়া অসুর-বিক্রমে বাগদাদের উপর আপতিত হয়। বাগদাদের দুর্বল রাজশক্তি কোনোক্রমেই সে প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ্ নির্দয়ভাবে নিহত হইলেন। যুদ্ধের অবসানে নরহত্যার অভিনয় চলিল, অমানুষিক অত্যাচারের সহিত সমগ্র নগরী লুণ্ঠিত হইল। অগণিত নরনারীর অকলঙ্ক শোণিতে রাজপথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দুই-তিন দিনের ভিতর মহানগরী বাগদাদ এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। সাদি এই নৃশংস অত্যাচার দর্শনে মর্মাহত হইয়া যে দুঃখব্যঞ্জক কবিতাটা লিখিয়াছিলেন, তাহার ছত্রে ছত্রে তদীয় উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগরাশি পরিস্ফুট হইয়াছে। সাদির সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভিতর অত্যাচারী জালেমের উপর যে শ্লেষবাক্য ও অবজ্ঞার চিহ্ন বিচ্ছুরিত দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবত বাগদাদের এই মর্মান্তিক স্মৃতিই তাহার মূলীভূত কারণ। (গোলেস্তাঁর প্রথম অধ্যায়েই সাদি রাজ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন)।

যাহা হউক, বাগদাদের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় তখন সাদি তথায় অবস্থান আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া স্বীয় ধর্মগুরুর সমভিব্যাহারে 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীনের ন্যায় তীর্থ দরশনে' মক্কাধামে প্রস্থান করিলেন। সাদি জীবনে চতুর্দশবার হজ্জ্বব্রত পালন করেন এবং ইহার অধিকাংশ বারই তিনি পদব্রজে মক্কাধামে উপনীত হইয়াছিলেন।

২

এই সময়ে হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সাদির দেশভ্রমণ আরম্ভ হয়। স্যর আউসলি লিখিয়াছেন—সুবিখ্যাত এবনে বতুতা ভিন্ন প্রাচ্যজগতে সাদির ন্যায় পরিব্রাজক আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সমগ্র পারস্য, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, জেরুজালেম, আর্মেনিয়া, আরবভূমি, মিসর, বারবারি, আবিসিনিয়া, তুর্কিস্তান ও ভারতের পশ্চিমাংশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রুদ্‌বার, জিলান, কাশগড় প্রভৃতি স্থানের কথা সাদি পুনঃপুন

---

১. শেখ আবদুল কাদের জিলানী সুফী সমাজে 'বড় পীর' নামে অভিহিত। মুসলমান সাধক-সমাজে তাঁহার স্থান সর্বোচ্চ। এমনকি হজরত মোহাম্মদ (দ.) ও মহাত্মা আলীর নিম্নেই ইঁহার স্থান। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি তপোবলে মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন।

উল্লেখ করিয়াছেন। বস্‌রা ও বাগদাদ হইতে সিথিয়ান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তিনি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সাদি গোলেস্তানে লিখিয়াছেন—

বসর্‌ আক্‌সায়ে আলম ব'গাশ্‌তাম বসে,
দর বোরদম্‌ আয়ামে ব'হর কাসে;
তামাত্তারা যে হর্‌ গোশা ইয়াফ্‌তাম্‌,
যে হর খেরমনে খোশা ইয়াফ্‌তাম্‌।

অনুবাদ—

ভ্রমিয়াছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ,
মিলিয়াছি সর্বদেশে সবাকার সনে;
প্রতি স্থানে জ্ঞানরেণু করি আহরণ,
প্রতি মৌসুমের শস্য করেছি ছেদন।

সাদির এই উক্তি মহাকবি টেনিসনের বর্ণিত সেই গ্রিক বীর ইউলিসিসের ভ্রমণকাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়—

"Always roaming with a hungry heart
Much have I seen and known;
cities and men
And manners, climates, councils,
governments,
(Myself not least but honoured of
them all)
And drunk delight of battle with
my peers.
Far on the ringing plains of Troy,
I am a part of all that I met."

সাদির জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলির সহিত এই কবিতার প্রত্যেক কথাই বেশ মিলিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি তখনকার যুগে লোককে পদব্রজে বা উষ্ট্র-আরোহণে দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে হইত। তৎকালে কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইলে যাত্রার তিন মাস পূর্বে তাহার বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত ট্যুর প্রোগ্রাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত না, এক দেশে কেহ গৌরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেও অন্য দেশে তাঁহার নাম পর্যন্ত ব্যক্ত হইবার কোনো সহজ উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় নব নব দেশে নব নব জাতির সহিত সংমিশ্রণ যে কী দুরূহ ব্যাপার ছিল, এখনকার দিনে তাহা কল্পনা করাও সুকঠিন। সাদিকে বিদেশে বর্বরদিগের হস্তে কত বার কত কষ্টই যে ভোগ করিতে হইয়াছে, তথাপি তাঁহার দেশভ্রমণের দারুণ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। একবার জেরুজালেম ভ্রমণকালে তিনি যে কিরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের লেখনীতেই সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে :

> কিছুকাল দামাস্কাস নগরে অবস্থানের পর তথাকার বন্ধুগণের সহবাস যখন আমার আর ভালো লাগিতেছিল না, তখন আমি একদিন গোপনে জেরুজালেমের দিকে প্রস্থান করিলাম। পথের দূরতা বা বিপদের আশঙ্কা কোনোদিনই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে নাই, আজিও করিল না। আমি খোদার উপর নির্ভর করিয়া গোপনে এই সুদূর দেশের পথিক হইলাম। কিন্তু খোদা বিপদের ভিতর দিয়া নানারূপে মানুষকে পরীক্ষা

করেন। আমারও পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আমি পথিমধ্যে দুর্দান্ত ফ্রাঙ্কগণ কর্তৃক ধৃত ও বন্দি হইয়া ত্রিপলিতে প্রেরিত হইলাম। এই স্থানে ইহুদি মজুরদিগের সহিত আমাকে মাটি কাটিতে হইত, তাহাদেরই সংসর্গে দিন যাপন করিতে হইত; আমার দুরবস্থার আর সীমা রহিল না। একদিন এইরূপে ইহুদিদিগের সহিত মাটি কাটিতেছি এমন সময় দেখিলাম, আলিপো শহরের এক সম্ভ্রান্ত বণিক সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। একসময় তাঁহার সহিত আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, আজ দুর্দিনে তিনি সে-কথা বিস্মৃত হইলেন না। আমার নিকটে আসিয়া তিনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সমুদয় কথা বিবৃত করিয়া কহিলাম—মানুষের সাহচর্য অবজ্ঞা করিয়া একদিন জেরুজালেমের অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, অধুনা এই পশুচরিত্র লোকদিগের সহিত আবদ্ধ হইয়া সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিয়াছি অরণ্যে পশু সহবাসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা অপেক্ষা বান্ধবসমাজে শৃঙ্খলিত জীবনযাপনও সহস্রগুণ শ্রেয়ঃ। বণিক তখন অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমার মনিবের নিকট দশ দিনার (স্থানীয় মুদ্রার নাম) ক্ষতিপূরণ দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। আমি তাঁহার সহিত আলিপো নগরে প্রস্থান করিলাম।

কিন্তু আলিপো গিয়াও আমার অদৃষ্টে সুখ হইল না। আমার উদ্ধারকর্তার এক বয়স্কা দুহিতা ছিল। অসামান্য বাকপটুতার জন্য এযাবৎ কেহ এই দুর্দান্ত রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে বণিকপ্রবর একশত দিনার যৌতুকসহ এই অমূল্য রত্নটি আমার করে অর্পণ করিলেন। নূতন প্রণয়ের অভিনবত্বে কিছুদিন বেশ কাটিল। তারপর নববধূ ক্রমে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক সময় হইতে আমারও ধৈর্য-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই বাঘিনীর সহিত অহর্নিশ কোন্দলে আমার শান্তিপ্রিয় জীবন শীঘ্রই এমন মসিময় হইয়া উঠিল যে, আমার আর সেখানে তিষ্ঠিয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। একদিন সেই গর্বিতা রমণী কহিল—হ্যাঁগো, তুমি কি সেই হতভাগ্য নও, যাকে আমার পিতা অনুগ্রহ করিয়া দশ দিনার মূল্য দিয়া ফ্রাঙ্কদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন? আমি উত্তরে কহিলাম—হ্যাঁ সুন্দরী, আমি সেই হতভাগ্য, যাহাকে তোমার পিতা দশ দিনার ব্যয়ে মুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় একশত দিনার দিয়া তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন!

সাদি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়া স্বীয় অবস্থাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন—

একদা বাঘের করে পড়েছিল পথহারা ছাগ,
উদ্ধারি আনিল তারে বৃদ্ধ এক সাধু মহাভাগ।
সাঁঝের আঁধারে যবে ঢেকে গেল দিবসের আলা,
অস্ত্র হানি' কণ্ঠে তার সাধু খেলে ঘাতকের পালা।
মুমূর্ষু পরানে ছাগ কাঁদি কয় চোখে ল'য়ে পানি—
'বৃক হতে উদ্ধারিয়া বৃক পুনঃ সাজিলা আপনি'।[১]

সাদির একটি অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, তিনি যে-অবস্থাতেই পতিত হইতেন, বিপদে

---

[১] শানিদাম্ কে গোস্ফন্দেরা রোজর্গে
রেহানিদ্ আজ দাহান্ ও দস্তে গোর্গে
শবাঙ্গাহ্ কারাদ বর্ হল্কাশ্ বে মালিদ
রুয়াঁ গোস্ফন্দ আজওয়ায় বে নালিদ
কে আজ চঙ্গলে গর্গম দর রবুদী
চু দিদম্ আকেবত গর্গম্ তু বুদী।

ধৈর্যহারা হইতেন না, পরন্তু অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা নিজকে মুক্ত করিতে পারিতেন। লোকে সহজেই তাঁহার বাক্যালাপ হইতে তাঁহার ভিতরের সারবত্তা বুঝিতে পারিত। কথিত আছে—সাইয়ূতের বাদশাহ জালালউদ্দীন সা'য়িতি সাদির একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। একদা সাদি তদীয় রাজধানীতে গমন-ব্যাপদেশে পথিমধ্যে এক সামন্তরাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার অনাড়ম্বর বেশভূষাবশত রাজবাটীতে তাঁহার তদ্রূপ সমাদর হইল না। সাদি ইহাতে বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পরদিন প্রভাতে আপন গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সাদি সাইয়ূত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পথিমধ্যে আবার ঐ রাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এবার কিন্তু তাঁহার অঙ্গে রাজপ্রদত্ত খেলাত ও শোভনীয় পরিচ্ছদ ছিল। সাদি দেখিলেন এবার তাঁহার সমাদরের আর সীমা নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অঙ্গের রাজকীয় পরিচ্ছদই তাঁহাকে এবারের এই অপ্রত্যাশিত সমাদরের মূল কারণ। তখন সাদি একটি নূতন অভিনয়ের অবতারণা করিলেন। আহারে বসিয়া যাবতীয় সুখাদ্য স্বীয় পরিচ্ছদের নানা স্থানে পুরিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতনামা পথিকের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সাদি তাহাদিগকে কহিলেন—যাহার প্রাপ্য তাহাকে খাওয়াইতেছি, ইহাতে আপনারা বিস্মিত হইতেছেন কেন? ক্রমে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সমুদয় অবগত হইয়া, সাইয়ূতের রাজগুরুর চরণে শতসহস্র প্রণতি জানাইয়াও কৃত অপরাধের বুঝি মার্জনা হইল না ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন উদারচেতা মহামতি গিয়াসুদ্দিন বুলবন দিল্লির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন তাঁহার অভয়বাণীতে মধ্য এশিয়ার মোগল-ভয়-ভীত অনেক আমির ওমরাহ ও বিদ্বানব্যক্তি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিল্লির রাজসভায় আশ্রয়গ্রহণ করেন।[১]

এই সময়ে পাঠান-দরবারে প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবি আমির খসরুর অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। তাঁহার কবিতার মাধুর্যে বিভোর হইয়া লোকে তাঁহাকে 'বুলবুলে হিন্দ' বলিয়া অভিহিত করিত। তদীয় সাহচর্যে বুলবনের পুত্র যুবরাজ মোহম্মদেরও সাহিত্যচর্চার পিপাসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, তিনি মধ্য-এশিয়ার যাবতীয় কবিকেই স্বীয় সুবা মুলতানে আহ্বান করেন। সুলতান মোহম্মদ শুধু-যে পিতা অপেক্ষা উদারচেতা ও সুশিক্ষিত ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যদিও যথাসময়েই এই নিমন্ত্রণবাণী সাদির দ্বারে পৌঁছিয়াছিল, তথাপি নানা কারণে সাদি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় বার্ধক্য ও তজ্জনিত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া সুলতান মোহম্মদকে অতি বিনয়-সহকারে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং তদীয় অনুগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করেন। অধিকন্তু সুলতান, যে আমির খসরুর ন্যায় মহাকবির বন্ধুত্বলাভ করিয়াছেন এই নিমিত্ত সাদি অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট খসরুর জন্য, তৎপ্রতি স্বীয় স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ স্বরচিত একপ্রস্থ গ্রন্থ উপহার প্রেরণ করেন।[২]

---

১. 'খাজানামে আমারা' নামক গ্রন্থে এই বিবরণ লিখিত আছে।

২. কথিত আছে, সাদি ইতিপূর্বে তিনবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং পাঠানরাজ আলতামাসের সময় কিছুকাল দিল্লিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন সাদি সোমনাথেও গমন করিয়াছিলেন। তদীয় গ্রন্থ বোস্তাঁর অষ্টম অধ্যায়ে সোমনাথের বর্ণনা আছে। খসরু অসাধারণ কবি ও বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ গৌরবান্বিত।

কিন্তু বার্ধ্যক্যের অজুহাতে মুলতানে আসিতে অস্বীকার করিলেও ইহার অনেক দিন পর আমির খসরুকে দেখিতে তিনি সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দিল্লি পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, বলিয়া শেখ আজরি প্রণীত জওয়াহেরুল আসরার গ্রন্থে উল্লেখ আছে। খসরু সাদি অপেক্ষা প্রায় ষাট বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সাদি যে বৃদ্ধ বয়সে এই উদীয়মান কবি ও সঙ্গীত-সাধক তরুণ যুবককে দেখিতে এতদূর আসিয়াছিলেন, ইহা অনেকেই সম্ভবপর মনে করেন না।

তৎকালীন মধ্য এশিয়ার আরো অনেক কবিই সাদির বন্ধুত্বলাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি নেজারির কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৈমুর বংশীয় লেখক সুলতান হোসেন লিখিয়াছেন—একদা সাদি তাঁহার গৃহে এক মিষ্টভাষী ও সদালাপী আগন্তুকের সাক্ষাৎলাভ করেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর সাদি বুঝিতে পারিলেন যে, এই নবাগত ব্যক্তি খোরাসানের অধিবাসী। তখন সাদি কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—খোরাসানের শিক্ষিত সমাজে কি শেখ সাদির কবিতা বিদিত আছে? আগন্তুক নম্রভাবে কহিলেন—হাঁ। তখন সাদি দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বরচিত দুই-একটি কবিতা তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। আগন্তুক তখন এমনই কৌশলে এই আবৃত্তি সমাধা করিলেন যে, তাহাতে সাদির অন্তরে দারুণ সন্দেহ হইল—এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই খোরাসানের প্রসিদ্ধ কবি হাকিম নেজারি। তখন সাদি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি সুপ্রসিদ্ধ হাকিম নেজারির কোনো কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন? আগন্তুক কহিল—

লোকে কয় মোর কেটে গেছে মোহ,
সুরার সাধনা ছেড়েছি—
কী ঘোর আপদ, কেন এ কুৎসা!
[কভু] তওবা কি আমি করেছি?

সাদির আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে ইনি কবিবর হাকিম নেজারি। অতঃপর সাদির অনুরোধে নেজারি তিন দিবস তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। এই তিন দিন সাদি তাঁহাকে আমির-ওমরাহের ন্যায় সমাদর ও আহারীয় দানে পরিতুষ্ট করিলেন। যাইবার কালে নেজারি সাদির ভৃত্যের নিকট বলিয়া গেলেন—বৎস, আমি আজ গৃহে চলিলাম, কিন্তু যদি কখনো তোমার প্রভুকে আমার গৃহে পাই, তখন অতিথিসৎকার কিরূপে করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে ভালোরূপে শিক্ষা দিব।

নেজারি চলিয়া গেলে এ-কথা যখন সাদির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি সহজে ইহার কোনো তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পরন্তু আপনার অজ্ঞাত কোনো ত্রুটির অনিশ্চিত গ্লানি হৃদয়ে অনুভব করিয়া লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন।

যাহা হউক, এই ঘটনার অনেকদিন পর একদা সাদি খোরাসানে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ হাকিম নেজারির আবাসভবনে উপনীত হন। নেজারি যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, তাঁহার প্রতি সমাদরের কোনোই ত্রুটি করিলেন না। সাদি এই স্থানে চারিদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চারিদিন নেজারির আহার্যের ব্যবস্থা দেখিয়া সাদি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। প্রথমদিন নেজারির পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সহিত সাদিকেও সাধারণ খাদ্যই প্রদান করিলেন, অতিথি বলিয়া তাঁহার খাদ্যসামগ্রীতে কোনোই নূতনত্ব দৃষ্ট হইল না। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার জন্য একটা তিতির পাখির সুরুয়া প্রস্তুত হইল। তৃতীয় দিনের আহার্য পলান্ন। চতুর্থ দিনের খাদ্যের সহিত একটু 'সুপ' ভিন্ন অতিরিক্ত অন্য কিছুই দৃষ্ট হইল না। যাহা হউক, সাদি নেজারির সমাদরে পরম

প্রীত হইলেন। যাইবার কালে নেজারি করজোড়ে অতি বিনয়-সহকারে কহিলেন—মহাত্মন, আপনি যে-নিয়মে অতিথি সৎকার করেন, সেভাবে বোধহয় দুই-চারি দিনের অধিক কোনো অতিথিকে সমাদর করা চলে না। কিন্তু জনাব! এ গরিবের গৃহে দেখিলেন—দুই-চারি দিন কেন, দুই-চারি বৎসর কোনো অতিথি যদি অনুগ্রহ করিয়া এ গৃহে অবস্থান করেন, তথাপি এ বান্দার বিন্দুমাত্রও অসুবিধার কারণ হইবে না। আমি যেন এই দরিদ্রভাবেই আজীবন আপনাদের ন্যায় মহাজনের সেবা করিতে পারি, আপনি এই আশীর্বাদ করুন। সাদি এতদিনে তাঁহার ভৃত্যের মুখে হাকিম নেজারির সেই পুরাতন কথাটির মর্ম বুঝিতে পারিলেন।

সাদি কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন তাহা তাঁহার ভারতীয় তরুণ কবি আমির খসরুকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে সুদূর পারস্য হইতে খাইবার ও সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দিল্লি আগমন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেখানে গুণ-গরিমা ও সৌন্দর্যের আভাস দেখিতেন, সেখানেই সাদি ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া যাইতেন। তিনি-যে শুধু এই মানসিক সৌন্দর্যেরই সমাদর করিতেন তাহা নহে, পক্ষান্তরে তিনি শারীরিক সৌন্দর্যেরও একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্লেটোর ন্যায় তিনি বালক ও যুবকদের সুন্দর মুখচ্ছবিতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ কারুকার্যের ললিতকলা দেখিতে পাইতেন, এজন্য বালক ও যুবকগণ তাঁহার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিল। কথিত আছে, তৎকালে তাব্রিজ নগরে প্রসিদ্ধ কবি হামামের পুত্র শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সৌন্দর্যের জন্য দেশবিখ্যাত ছিল। সাদি এই বালককে দেখিবার জন্য তাব্রিজ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সাদি যে তাঁহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, হামাম তাহা জানিতেন না; স্নানাগারে উভয়ের সাক্ষাৎ। পুত্রটি হামামের সঙ্গেই ছিল। হামাম তাহাকে এতই ভালোবাসিতেন যে, মুহূর্তের জন্যও তাহাকে নয়নের অন্তরালে করিতেন না। স্নানাগারে অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া হামাম বিরক্ত হইলেন। কিন্তু সুচতুর সাদি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, বালকটিকে ভালো করিয়া দেখিবার মানসে একটি জলপাত্র জলপূর্ণ করিয়া হামামের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই অনাহুত শিষ্টাচারে হামাম অধিকতর বিরক্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায় হে?

সাদি উত্তর করিলেন—পবিত্র সিরাজনগরে।

ব্যঙ্গ সুরে হামাম কহিলেন—কেন ইতিপূর্বেই তো সিরাজীরা তাব্রিজের কুকুরদলকে সংখ্যায় ছাড়াইয়া উঠিয়াছে?

সাদি হাসিয়া কহিলেন—তাই তো এখানে দেখছি আমাদের দেশের ঠিক উল্টো; সেখানে যে তাব্রিজিরা (সিরাজের কুকুর দল হইতে) সংখ্যায় মর্যাদায় কম।

হামাম একটু অপ্রস্তুত হইলেন। মুহূর্তেক থামিয়া পুনরায় অন্য দিক দিয়া সাদিকে আক্রমণ করিলেন। নিজের হস্তস্থিত জলপাত্রটা উল্টাইয়া ধরিয়া সাদিকে কহিলেন—আচ্ছা সাহেব, সিরাজিদের মাথাগুলো আমার ঘটার তলার মতো (নির্লোম) হল কী ক'রে? (সিরাজিদের মাথায় প্রায়ই টাক পড়িত এবং সাদিরও পড়িয়াছিল।)

সাদি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—ঠিক যেমন করে তাব্রিজিদের মাথাগুলো উহার ভিতর দিকটার মতো (শূন্যগর্ভ) হয়েছে।

হামাম বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বীয় কবিত্বের প্রভাবে এই দুর্জয় আগন্তুককে পরাস্ত করিতে মনস্থ করিয়া কহিলেন—বলি, তোমাদের সিরাজনগরে কবি হামামের কবিতার কথা কখনো শুনেছ?

সাদি বলিলেন, হাঁ, শুনেছি বৈকি?

হামাম তখন সুবিধা পাইয়া স্বরচিত দুই-একটি কবিতা সাদিকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। সাদি আবৃত্তি করিলেন—

নয়ন যাহারে চায় তাহারি সম্মুখে
আবরণ টেনেছে হামাম:
সময় বহিয়া যায় পরিশ্রান্ত আমি,
এবে তার হোক অবসান।

বলা বাহুল্য, এ কবিতা সাদির নিজের রচনা। কবিতার লক্ষ্যস্থল ঐ বালকটি। হামাম তখন বুঝিলেন, তিনি আজ সামান্য লোকের পাল্লায় পড়েন নাই। যাহার সহিত মূর্খের ন্যায় তিনি সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সিরাজের অমূল্যরত্ন সাদি ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। অতঃপর তিনি সসম্মানে সাদির পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। সাদিও তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

সুলতান হোসেন বলেন,[1] হামামের পুত্র স্বীয় চঞ্চলপ্রকৃতি-নিবন্ধন দীর্ঘকাল বসিয়া সাদির কবিতা শুনিতে ভালোবাসিত না বলিয়া সাদি তাহারই উপরোধে নূতন ধরনের ছোট কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সুলতান হোসেন এতাদৃশ আরো অনেক গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলে, সুফী কবিদিগের মনের উপর কিশোর-সৌন্দর্যের যে কী অসাধারণ প্রভাব তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

সাদির নিজের পুত্রও অত্যন্ত সুন্দর ও মেধাবী ছিল। সাদি সেজন্য মনে মনে একটু গর্বিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পুত্রটি কিশোর বয়সেই কাল-কবলে নিপতিত হয়। একমাত্র পুত্রের এই অকালমৃত্যুতে সাদি বৃদ্ধবয়সে কিরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, বোস্তাঁনের নবম অধ্যায়ে তাহার আভাস পরিলক্ষিত হয়। এই পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা ভিন্ন সাদির আর সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি দুইবার দার পরিগ্রহ করেন, প্রথমা পত্নী আলিপো শহরের, আমরা তাঁহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয়বার পিত্রালয় ইমনের রাজধানী 'সারা' নগরে। প্রাচ্যদেশীয় কবিদিগের যাহা সাধারণ নিয়ম সাদিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাঁহার পারিবারিক জীবন সাধারণের অজ্ঞাত। আদালত খান[2] বলেন—সাদিও স্বীয় ভাগিনেয় হাফেজের সহিত তদীয় কন্যাটির বিবাহ দিয়েছিলেন। মিরান্ডার ন্যায় এই কন্যাটি ভিন্ন সাদির বৃদ্ধবয়সে সান্ত্বনা দিবার আর কেহই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না।

৩

পরিণত বয়সে সাদি সিরাজের নিকটবর্তী এক নির্জন আশ্রমে জীবন যাপন করিতেন। এখানে তিনি অধিকাংশ সময়ই গভীর ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কেবল সময়-সময় সমাগত আগন্তুকদিগকে সাক্ষাৎদানের নিমিত্ত আশ্রমের বাহিরে আসিতেন। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাহার বুকে লইয়া তিনি তখন সংসারের সীমান্তে দণ্ডায়মান সকল তৃষ্ণা, সকল আকাঙ্ক্ষার অনিত্যতাবোধ তাঁহার হৃদয়ে একপ্রকার অচঞ্চল সাম্যের মহিমা

---

[1] তদীয় 'মোজালেসে আশাক' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

[2] ফোর্ট উইলিয়ামের পারস্য অধ্যাপক।

বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছিল। ঊর্ধ্বে অনন্ত উদার নীলাকাশ, চারিধারে ধরণীর সীমাহীন বিস্তৃতির অঞ্চল ঘিরিয়া দূর চক্রবালরেখা তাঁহার হৃদয়ে অসীমের তরঙ্গখেলা আনয়ন করিত। রজনীতে জগৎ যখন ঘুমঘোরে অচেতন হইত, প্রকৃতির নীরবতা দেখিয়া আকাশ যখন সহস্র-কোটি প্রদীপ জ্বালিয়া বিধাতা আরতি দিত, সাদি তখন ধ্যানরাজ্যের অন্তহীন গভীরতায় নিমজ্জিত হইতেন। আকাশের চাঁদ ক্রমে পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িত, নক্ষত্রের দল একে একে নীলাঞ্চলে মুখ ঢাকিত, সাদির ধ্যানমুক্ত হৃদয় তখন উষার মলয়স্পর্শে চারিধারের কুসুমরাশিরই ন্যায় উন্মেষিত হইয়া উঠিত। প্রভাতসূর্য তাঁহার গোলাপি শয্যার লোহিত আস্তরণ হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্বেই সাদি সুমধুর আজানে নীরব প্রান্তর হইতে অদূর বনানীর তটদেশ পর্যন্ত মুখরিত করিয়া সেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রণত হইতেন।

সাদির এই শান্তিময় আশ্রমের গাম্ভীর্য নষ্ট হইত সময়-সময় নবাগত আগন্তুকদিগের দ্বারা। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা, সকলেই মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইত। শিক্ষিত ও পুণ্যাত্মাগণ নানাপ্রকার তত্ত্বকথা আলোচনা করিবার সময়-সময় সাদির পাদমূলে সমবেত হইতেন। আমির-ওমরাহ্‌গণ সাদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে প্রায়ই সাদির জন্য নানাপ্রকার পক্ব অথবা অপক্ব মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপহারস্বরূপ সঙ্গে আনিতেন। সাদি প্রায়ই তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেন ও আগন্তুকদিগকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিতেন। তাঁহার বরাবরই অভ্যাস ছিল, তিনি ভুক্তাবশিষ্ট অংশ একটি ঝুড়িতে করিয়া আশ্রমের বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিতেন; দরিদ্র কাঠুরিয়াগণ সারাদিন বনপ্রদেশে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় ঐ সকল খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কথিত আছে, একদা এক দুরাশয় তস্কর ঐ ঝুড়ির খাদ্য অপহরণ মানসে কাঠুরিয়ার পরিচ্ছদে তথায় আগমন করে এবং সাদিকে ধ্যানাবিষ্ট দেখিয়া চৌর্যকার্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়, যেইমাত্র সে ঝুড়ির দিকে হাত বাড়াইয়াছে অমনি তাহার হাত দুইখানি প্রস্তরবৎ কঠিন ও নিশ্চল হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও হতভাগ্য যখন কিছুতেই আর হাত দুইটি নামাইতে বা সে-স্থান হইতে নড়িতে পারিল না, তখন অগত্যা সে অশ্রুপূর্ণলোচনে অনুনয়-বিনয় করিয়া মহর্ষি সাদির করুণা-ভিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ অতীত হইলে কোমল-হৃদয় সাদি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বাহিরে আসিয়া চোরের দেহে কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—হাঁরে নরাধম, তুই যদি প্রকৃত কাঠুরিয়াই হইবি, তবে তোর সুবৃহৎ কুঠার কই, তোর হাতের সুকঠিন কড়াচিহ্ন কই, কাঠুরিয়ার উপযুক্ত সুদৃঢ় ও কণ্টকক্ষত দেহই-বা কই? তবে কি তুই দস্যু? তাই যদি হবে, তবে তোর তীক্ষ্ণধার শাণিত অস্ত্র ও প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযুক্ত রজ্জু কই? অমানুষিক সাহস ও তেজস্বিতার পরিবর্তে এই নারীসুলভ দীনতা ও রোদনই-বা তোর কেন? তুই অতি ইতর নীচাশয় তস্কর; তোর মতো কৃপার পাত্র জগতে আর কে আছে? তুই এই মুহূর্তে এ স্থান পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তিরস্কার করত মহর্ষি একান্ত-মনে খোদার নিকট 'মোনাজাত' করিলে হতভাগ্য অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিল। অতঃপর ঝুড়ি হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য দিয়া মহর্ষি তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

ক্রমে ক্রমে যখন সাদির চরিত্র-মাহাত্ম্য ও সাধনার খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন দৈনিক শত শত লোক আশ্রমে আসিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া

যাইত। যাহারা অনুসন্ধিৎসু তাহারা সাদির পাদমূলে বসিয়া নানা তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু সিরাজনগরে একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি সাদির এই অত্যধিক সম্মানে ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা অনুভব করিতেন। অধিকন্তু সাদির তপঃসিদ্ধি বিষয়েও তদ্রূপ আস্থাবান ছিলেন না। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—তিনি যেন স্বর্গরাজ্যে বিহার করিতেছেন, তাহার চতুর্দিকে পুণ্যবাণদিগের আত্মাসমূহ মধুরস্বরে পরম কারুণিক খোদাতা'লার গুণগান করিতেছে। সাধু মনোনিবেশ সহকারে তাহাদের স্তুতিগাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাহারা মহাকবি সাদিরই রচিত একটি স্তোত্র একান্ত-মনে আবৃত্তি করিতেছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল—মহর্ষি সাদির এই একটিমাত্র স্তোত্রে খোদাতা'লা যেমন সন্তুষ্ট হন, যাবতীয় ফেরেশতার সমস্ত বৎসরের উপাসনাতেও তিনি তেমন সন্তুষ্ট হন না। নিদ্রাভঙ্গে সাধু কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সাদির আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সাদি তখন 'মোরাকেবা'য় বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া ঠিক সেই কবিতাটিই গভীর ভক্তি সহকারে আবৃত্তি করিতেছিলেন। এই ঘটনায় সাধু একান্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া মহর্ষি সাদির চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। স্তোত্রটি এই—

বর্গে দরখ্‌ তানে সব্‌জ্‌ দর্‌ নজরে হোশিয়ার—
হর্‌ ওরকে দফ্‌তরেস্ত মা'রেফাতে কের্‌দেগার।[১]

সা'দের পৌত্র মোহাম্মদ শা'র রাজত্বকালে মহর্ষি সাদি সিরাজনগরে দেহত্যাগ করেন। জনৈক পারস্য-কবি তৎকালীন রীতি অনুসারে তদীয় মৃত্যু-সন জ্ঞাপন করিয়া এক কবিতা[২] রচনা করেন। তাহাতে হিজরি ৬৯১ সন (ইং ১২৯২) সাদির স্বর্গারোহণ বৎসর বলিয়া সূচিত হইয়াছে। সিরাজের পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের পাদমূলে, 'দেলকোশা' নামক স্থানে কবির শেষচিহ্ন সমাহিত রহিয়াছে। সমাধির উপর যে সুদৃশ্য ক্ষুদ্র প্রস্তর-মন্দির নির্মিত হইয়াছে, তাহার গাত্রে সাদির জীবনী-সংক্রান্ত অনেক কথা ও তাঁহার রচিত অনেক কবিতা প্রাচীন নক্‌স্‌-অক্ষরে অতি সুন্দরভাবে খোদিত হইয়াছে। আজিও যাত্রীগণ নানা ফল-ফুল ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য উক্ত সমাধিগৃহে ভক্তিভাবে উপহার দিয়া থাকে। দর্শকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য, অতি সুন্দরভাবে লিখিত সাদির একখানি কাব্যগ্রন্থ উক্ত সমাধিগৃহে রক্ষিত হইয়াছে। পারস্যে ঐ সমাধিগৃহ 'সাদিয়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অধুনা উহা কিঞ্চিৎ ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে।

---

১. অর্থ : হে প্রভো! তোমাকে বুঝিবার জন্য সহস্র খণ্ড 'হাদিস' ও দর্শনের প্রয়োজন হয় না। ঐ যে শ্যামল তরুশিরে সুচিত্রিত পল্লবরাজি, জ্ঞানীর নয়নে উহার প্রত্যেক পত্র তোমার মাহাত্ম্যপূর্ণ এক একটি মহাগ্রন্থস্বরূপ।

২. শবে আদিনা বুদ ও মাহে শওয়াল
যে তারিখে আরব খে-সিন-আলেফ সাল।
হোমায়ে রুহে পাক শেখ সা'দী
বে-হয়াফশান্দ আজ গোবারে তন্‌ পর্‌ ও বাল।
অর্থ—৪র্থ-সিব-আলেফ—৬১৯। ঐসনে আরবী শওয়াল মাসের জুম্মা অর্থাৎ শুক্রবারের পূর্ববর্তী রাত্রিতে শেখ সাদির প্রাণরূপ পবিত্র হোমাপাখি দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ বিস্তার করিল।

ফ্রাঙ্কলিন সাহেব লিখিয়াছেন—পারস্য ভ্রমণকালে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের নিকটবর্তী কোনো প্রাসাদে সাদির একখানি 'তসবির' তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের চিত্র—বক্ষে বিলম্বিত রজতশ্মশ্রু, সঙ্গে দোদুল্যমান রাজকীয় খেলাত। দক্ষিণ হস্তে সুশোভিত দ্বিরদ-রদ-নির্মিত শ্বেতযষ্টির গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ আনত; বামহস্তে কারুকার্য বিখচিত 'লোবান'-ধূম্র-সুরভিত মনোহর ধূপদান। না-জানি কোন্ দুঃসাহসী ভক্ত ধর্মের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও সাদির এই বিশ্বপ্রণম্য তসবিরখানি আঁকিয়া গিয়াছেন।

সাদি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে ৩/৪ ঘণ্টা করিয়া কোরআন পাঠ করা তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস ছিল। জীবনে তিনি কখনো সুরা স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার গৃহে কখনো বেনামাজি ভৃত্য নিযুক্ত হইতে পারিত না। কঠোর সংযমের ফলে তিনি বার্ধক্যেও যৌবনের তেজ ধারণ করিতেন। সাদি নিজেই লিখিয়াছেন—

> বার্ধক্যের সাড়া পেয়ে বসেছে আমার
> শিরে শুভ্র তুষারের মেলা;
> তথাপি অজর মম প্রকৃতি মাঝার
> যৌবনের বীর্য করে খেলা।[1]

আজীবন লোকশিক্ষা ও বিপন্নের উপকার সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। মৌলিক উপদেশ বিতরণ, গ্রন্থ প্রচার ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ইত্যাদি নানা উপায়ে নানা দেশে তিনি ভ্রমণ ব্যাপদেশে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কখনো কখনো দুস্থ পরিবারের রোরুদ্যমান গৃহে উপনীত হইয়া সান্ত্বনা ও আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতেন। খাইবারের গিরি-সঙ্কটে বা বার্বেরির মরুপ্রান্তরে পণ্যজীবী পথিকগণ সময়-সময় যে শান্ত-স্বভাব হাস্য-চটুল রসিক বৃদ্ধের সদালাপে ও কোমল সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদের সুখ-দুঃখ ও ঘরকন্নার সহস্র কথা অকপটে নিবেদন করিত তাহাও এই লোকচরিত্রের নিপুণ পাঠক, বিশ্বছবির ভক্ত দর্শক, জ্ঞানপিপাসু সাদিরই অন্য মূর্তি। জেরুজালেমে তীর্থযাত্রীদিগের জলকষ্ট দেখিয়া ব্যথায় তাঁহার করুণ হৃদয় এমনই ভাবে কাঁদিয়াছিল যে ক্রমাগত বহু বৎসর ধরিয়া তিনি সেই মরুর দেশে তীর্থের সময়ে ভিস্তিঅলার ছদ্মবেশে লক্ষ লক্ষ লোককে জলদান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। কত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র-যে তাহাদের নিদাঘ-মধ্যাহ্নের দারুণ পিপাসায় সুশীতল বারি পান করিয়া কৃতজ্ঞতার তরল অশ্রুতে এই মহাপ্রাণ দেবতার চরণতল নিষিক্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেবাধর্ম সম্বন্ধে সাদির সেই অমর বাণী মুসলিম জগতে সুপরিচিত :

> তরিকৎ বজুজ্ খেদমতে খাল্‌ক্ নিস্ত
> বতস্‌বিহ্ ও ছাজ্জাদা ও দল্‌ক্ নিস্ত[2]

শাম দেশের (সিরিয়ার) মরুপথে যে-সকল পান্থনিবাস সাদির পরিশ্রমে দীর্ঘকাল জলাভাব হইতে নির্মুক্ত ছিল, তাঁহার শাম ত্যাগের বহুকাল পর পর্যন্তও পথিকেরা ঐ পথে চলিবার সময় সেই করুণহৃদয় বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিত।

---

১. বরফে পীরী মী-নেসিনাদ বর্ ছরম্
হামচুঁ না তাবায়াম্ জওয়ানী মী-কুনাদ।

২. তরিকৎ কিছু নয় বিশ্বসেবা বিনা;
খেল্‌কা তসবি, জা'নমাজ-নহেকো সাধনা।

সাদি প্রকৃতই প্রাচ্য দেশীয় মুসলমানদিগের শিক্ষাগুরু। তদীয় গোলেস্তাঁন ও বোস্তাঁন পাঠে আমরা যেরূপ তাঁহার লোকচরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও মানুষের আচার-ব্যবহার ও সমাজনীতির উপর অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হই, সেইরূপ কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্র সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতে পারিতেন তাহা ভাবিয়াও চমৎকৃত হই। বিশাল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-সকল কদাচার ও পাপানুষ্ঠান নিত্য নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের সহজ দৃষ্টির সজাগতাকে এড়াইয়া গিয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী সাদির নিপুণ তুলিকায় সেগুলি এমনই করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সেগুলির ভিতরকার অচিন্ত্যপূর্ব স্বরূপ পাঠককে যুগপৎ লজ্জা ও বিস্ময়ের নূতন চেতনায় অভিভূত করিয়া ফেলে। কোথাও এক নিষ্ঠাবান দরবেশ দিনমানে দশ সের খাদ্য উদরস্থ করিয়া সমস্ত রজনী আরাধনায় জাগিয়া থাকিত—সাধনার এই বিপুল আড়ম্বর অপেক্ষা দিনান্তে অর্ধসের ভোজন ও সারা নিশি সুষুপ্তি যে খোদার নিকট অধিকতর প্রিয়—এ-কথাটা সাদি যেমন করিয়া বলিয়াছেন এমন আর কয়জনে পারে? মৃত্যুর কবল হইতে একটি নিঃসহায় প্রাণীকে উদ্ধার করিয়া পারিবারিক ভোজে তাহার জীবনের সদ্ব্যবহার যে কিরূপ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, তাহা বর্ণনা করিতে সাদি লিখিয়াছিলেন—একদিন স্নানাগারে গমন করিলে একখণ্ড মৃত্তিকার মনোহর সুরভিতে সাদির মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইলে সাদি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন :

হে সুগন্ধি মৃৎরূপী, কহ তো বিবরি
তুমি কি অম্বার মণি অথবা কস্তুরী?

মৃত্তিকা সবিনয়ে উত্তর করিল:

নাহিকো অম্বার আমি, নাহি কস্তুরিকা—
গোলাবের মূলে ছিনু—আমিরে 'মৃত্তিকা'।[১]

উপদেশ দানের এমন সহজ উপায় কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন। মহর্ষি রামকৃষ্ণ পরমহংস ভিন্ন বঙ্গদেশে এমন উপদেষ্টার দৃষ্টান্ত আর মিলে না। লোকে সাদিকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি দর্শন শিখিয়াছেন কাহার নিকট? সাদি কহিলেন—অন্ধের নিকট, কেননা অন্ধেরা সম্মুখের ভূমি সম্যক পরীক্ষা না করিয়া কদাপি পদক্ষেপ করে না। গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ ভিন্ন সাদির আরো ২২ খানি গ্রন্থ এখনো কালের আঘাত সহিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহার কতকগুলি খণ্ড-কবিতা মাত্র। দুই-একটির রুচিও কিঞ্চিৎ কদর্য। সর্বসমেত তিনি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, এখন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। হয়তো মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে তাঁহার আরো অনেক গ্রন্থ নষ্ট হইয়া থাকিবে। মি. ব্রায়াম বলেন—আরবিতেও সাদির বিংশ খণ্ড গ্রন্থ লিখিত আছে কিন্তু এ-কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। স্যর উইলিয়াম জোন্স লিখিয়াছেন—"His life was wholly spent in travel, but no man who enjoyed the greatest leisure, ever left behind him more valuable fruits of his genius and industry." তাঁহার রচিত কোনো-কোনো কবিতায় অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তদীয় 'মোক্তায়াত' নামক কবিতার প্রত্যেক চরণ অষ্টাদশ বিভিন্ন ভাষায়

---

[১] গোফ্‌তা মান্‌গোলে না চিজ্‌ বুদামে
ওলায়কেন্‌ মোদ্দাতে বা গোল্‌ নেশাস্তমে।

লিখিত। ফরাসি লেখক গার্সিন ডি ট্যাসি বলেন—সাদিই প্রথম হিন্দুস্তানি ভাষায় কবিতা রচনা করেন।[1]

সাদির গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ যেরূপ বিপুলভাবে ও বহুযুগ ব্যাপিয়া পঠিত হইয়া আসিতেছে, জগতে আর কোনো গ্রন্থ তেমন হয় নাই। ভারতে মুসলমান আমলে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক নরনারীকেই গোলেস্তাঁর সংশ্রবে আসিতে হইত। ফরাসি বর্ণমালা শিক্ষার পরই ছাত্রগণকে গোলেস্তাঁয় দীক্ষাদান করা হয়।[2] এখনো কোনো মাদরসার নিকট দিয়া যাইতে হইলে শিশুগণের সুললিত কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়—

> "কারীমা বে-বখ্‌শায়ে বর্‌ হালে মা
> কে হাস্তম্‌ আসীরে কামান্দে হাওয়া।
> না দারেম গায়েরাজ তু ফরিয়াদ রাস্‌
> তু-য়ী আসীয়াঁরা খাতা-বখ্‌শ্‌ ও বাস্‌।
> নেগাহ্‌দার মা'রা যে-রাহে খাতা
> খাতা দার্‌ গোজারো সওয়াবম্‌ নমা।"

আজও শেষ সাদির 'বয়াত' আবৃত্তি না করিলে মৌলবীগণ ধর্মসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। ডি হার্বেলট নামক জনৈক লেখক সাদির 'পান্দনামা'কে পিথাগোরাসের 'গোল্ডেন ভার্সেস্‌' নামক গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'গোল্ডেন ভার্সেস্‌' একসময়ে সমগ্র গ্রিক-জগতে বালকগণের নীতিপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

এক-একটি ক্ষুদ্র গল্প ও তৎসহ একটি করিয়া নীতিমূলক কবিতা—এইভাবে সমগ্র গোলেস্তাঁ রচিত। বোস্তাঁকে শুধু কবিতাগ্রন্থ বলিলেই চলে। সাদির সমস্ত রচনাই অতি সরস ও প্রাঞ্জল। তিনি জীবনে যেমন রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার রচনায়ও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, সাদি অনেক সময় নিতান্ত গ্রাম্য দোসে দুষ্ট অশ্লীল রসিকতায়ও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের কোথাও আষাঢ়ের ঘনঘটা বা বিপুল সাগর-গর্জনের ন্যায় বাগাড়ম্বর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার রচনাপ্রবাহ ধীর, প্রশান্ত ও উদার; উহা বিশাল জলপ্রবাহের ন্যায় মানবের সমগ্র জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া সংসারের সকল কর্মক্ষেত্রকে নিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সাদির প্রদত্ত সে রসাধার কখনো শুকাইবার নহে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকে উহা মনস্থ করিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইবে। ত্রিকালদর্শী সাধকের অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া—খোদাপ্রাপ্ত ভক্তের মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া উহা যেন জগতের পরতে পরতে শিকড় আঁটিয়া অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে।

---

[1] (১) মোজালেসে খাম্‌সা, (২) নসিহত-অল্‌-মলুক, (৩) রেসালায়ে আস্কিয়ানো, (৪) রেসালায়ে সাহেবে দিউয়ান, (৫) রেসালা দর্‌ তকরীরে দিবাচা, (৬) রেসালায়ে আক্‌ল্‌ ও এশ্‌ক্‌, (৭) কেতাব মিরাসী, (৮) তরজিয়াত, (৯) আত্তবিয়াত, (১০) বেনাইয়া, (১১) কেতাবে মোলাম্মায়াত, (১২) মোক্তায়াত, (১৩) কাসায়েদল আরাবী, (১৪) কাসায়েদল ফারসী, (১৫) আল্‌ থবিসাত, (১৬) সামস্‌উদ্দিন তাজী কো, (১৭) ব'জল্লিয়াত, (১৮) রুবাইয়াত, (১৯) মোফ্‌রেদাত, (২০) খাতিম, (২১) গজলিয়াতে কাদিম, (২২) কেতাবে সাহেবীয়া। সাদির এই বাইশখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এস্‌, রুষো বলেন—সাদির 'দিউয়ান' নামক গ্রন্থে প্রায় ১০০০ কবিতা আছে, তাহা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো ইউরোপে কোনো লাইব্রেরিতে উহা রক্ষিত হইয়া থাকিবে।

[2] খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গোলেস্তাঁ ইউরোপে প্রচারিত হয়। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জেন্টিয়াস নামক এক ব্যক্তি আমস্টারডাম নগরে 'রোসারিয়াম পলিটিকাম' নাম দিয়া গোলেস্তাঁর এক লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্কেল্‌ফার্গ নগরে ভন ওলিরিয়াস কর্তৃক উহার জর্মন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে উহা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। এক্ষণে ইউরোপের প্রধান প্রধান যাবতীয় ভাষাতেই গোলেস্তাঁ প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি হাফেজ

এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিশাল 'হরণ পূরণের' মেলা। একদিকে ভাঙা, অন্য দিকে গড়া; এই দুই চিত্রের ভিতর এক মহাশক্তি দোলা দিতেছে। আজ যাহা সৃষ্টির গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কালই তাহা আবার ধ্বংসের বিরাট আঁধারে ঢাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া, এই ভাঙা-গড়ার অন্তরাল দিয়া, ছন্দে ছন্দে, পলকে পলকে এক নিত্য সনাতন শক্তির অনন্ত নর্তন ধ্বনিয়া উঠিতেছে।—

"কতকাল এই লীলা গো, অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে অপূর্ব এ দোল!
দুলিতেছে—দোলা দিতেছে;
পলকে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে পলকে হরিয়া নিতেছে।"

বিশাল সমুদ্রে আমরা কী দেখিতে পাই? তরঙ্গের সমষ্টি! জলময় তরঙ্গরাশি ভিন্ন তো আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই বিপুল তরঙ্গরাশি অবিরাম ভাঙিতেছে, গড়িতেছে—সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিতেছে, আবার চুরমার হইয়া ধসিয়া পড়িতেছে। ধ্বংস আর গঠনের বিরাট অভিনয়। কিন্তু এই ধ্বংসের ভিতর দিয়া সমুদ্র তো যেমন তেমনি রহিয়া যাইতেছে! তেমনি ঐ বসন্ত আপনার ফুল কোকিল লইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেল; গ্রীষ্ম আসিল, বর্ষা আসিল, শরৎ ও শীতের অন্তে আবার বসন্তের আবির্ভাব হইল। কী আসিল? যাহাকে বসন্ত বলিয়া বরিয়া লইলাম, সে কী? কী তাহা কে বলিবে? শুধু দেখা গেল—ফুল ফুটিল, আকাশ হাসিল, তরুলতা মুঞ্জরিল, দোয়েল-শ্যামা-কোকিলের সুরে আকাশ ভরিয়া গেল। এ অভিনব আয়োজনে কাহার আবির্ভাব হইল? যে ঐশীশক্তি ধরাকে নিত্যনব সাজ পরাইতেছে, দ্বাদশ মাসরূপ দ্বাদশ ছত্রের ভিতর দিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিতেছে, বসন্তে তাঁহারই এক অভিনব বিকাশ হয় না কি?

নবোদ্ভিন্ন লতিকার নর্তনশীল শ্যামল পত্রাভরণে যে-সুষমা, বিকশিত কুসুমের সুরভিত হাসিতে যে-মাধুর্য, শুষ্ক ভূতল-লুণ্ঠিত মুকুলের ম্লান-দৈন্যে যে নীরব গাম্ভীর্য—সে সকলই সেই মহাশক্তির বিরাট মহিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। সূর্যের বিশ্বদাহী রশ্মিতে, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কৌমুদীতে, নক্ষত্রের গূঢ় অব্যক্ত কিরণে তাঁহারই উদারতা, তাঁহারই অনধিগম্যতা পরিব্যক্ত হইতেছে।

হাফেজ এই মহাসত্য স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। হাফেজের সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

যিনি তোমার আমার নয়ন হইতে প্রচ্ছন্ন, অথচ কখনো কখনো অজানা মুহূর্তের ফাঁক দিয়া আমাদের সকলেরই অন্তরে হঠাৎ সাড়া দিয়া উঠে—ব্যথিতের শান্তিরূপে, হতাশের আশারূপে নিরবলম্বনের আশ্রয়রূপে যিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন, ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া সেই 'কাছে পেয়ে কাছে না পাই' ভাবে আমাদের সঙ্গে লীলাখেলার অভিনয় করেন—ভ্রমণে, বিহারে হঠাৎ স্বপ্নের মতো চিন্তার কোলে ভাসিয়া উঠিয়া,

আঁধার প্রাণে একটু অস্ফুটন্ত কিরণ ঢালিয়া অন্তর্ধান করেন—সেই লীলাময় গোপন পুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া হাফেজের নিকট ধরা দিয়াছিলেন। একদিন ইনিই ওমর খাইয়ামের অমর-বীণায় সুরালাপ করিয়াছিলেন—ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সজ্ঞানতা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আবার ইনিই আজ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন :

অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে অপূর্ব এ দোল।

এই-যে কবিপ্রতিভা যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া কালের বক্ষে পুনঃপুন প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বমানবকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে; মরমে পশিয়া অন্তরের অন্তস্তলকে আকুল করিতেছে, পারস্য-প্রসূন হাফেজে তাহারই এক অভিনব বিকাশ, মানব চিরকালই ভাবের উপাসক। কবি সেই ভাবরাজ্যের শিল্পী; ভাব লইয়াই তাঁহার লীলাখেলা। তাই কবিতা কখনো পুরাতন হয় না। চিরন্তন আত্মার ন্যায় উহা অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষের প্রাণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া আসিতেছে। তাই 'কবিতা কালের সাক্ষী—কবিরা অমর'। আর এই বিশাল ভাবরাজ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম, হাফেজ সেই ভগবৎপ্রেমের কবি। হাফেজের সমগ্র কাব্যের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, এই একই সুর ঝঙ্কার দিতেছে।

হাফেজ যখন আপনার অপার্থিব সঙ্গীতে পারস্যের সাহিত্যকানন মুখরিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বঙ্গের এই শ্যামলকুঞ্জ মধুময় করিয়া একজন বঙ্গকবি আপনার বীণায় সুরালাপ করিতেছিলেন। ইনি বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। মহাএশিয়ার দুই বিভিন্ন কোণে, দুই সাধক একই সময় একই সুরের আলাপ করিতেছিলেন। যেখানে হাফেজ বলিয়াছেন—

ঢালো সুরা সখি! সাজাও পেয়ালা শরম আছে কি তায়।
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো 'ধরম' যাহারা চায় ॥

সেখানে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি! তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা।

ঠিক হাফেজেরই মতো চণ্ডীদাসও গাহিতেছেন—

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।

আবার অন্যত্র—

তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়—
দেখবি, সেই আলোর মাঝে কালো।—(চণ্ডীদাস)

আবার বহুকাল পরে আজ রবীন্দ্রনাথেও ঐ সুর নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। এ সুর যে নিত্য, চিরস্থায়ী! উহা 'নবরসের' প্রবাহে রসময় নহে, ষড়রিপুর লীলাবৈচিত্র্যেও উহা অপরপ্লিত নহে। উহা ক্রোধরূপে হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়া অঙ্গাররূপে নিঃশেষ রাখিয়া যায় না, লালসা-জড়িত-প্রবৃত্তির ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আবার উহাকে মূর্ছিত ও অবসন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যায় না, পরন্তু যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় মৃদু-কলনাদে ভক্তের প্রাণের গোপন প্রদেশে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, নিত্য সনাতন মহামিলনের পানে অনাহত ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে—তরঙ্গে তরঙ্গে অপূর্ব মূর্ছনার উদ্বোধন করিয়া ভক্তের প্রাণ বিভোর করিতেছে—হাফেজ সেই পরমার্থিক প্রেমের উপাসক ছিলেন।

হাফেজ মরিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার অমরত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আজ সাতশত বৎসর হইল, সিরাজের কোকিল অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, রোকনাবাদের তট-মূর্ছিত প্রদোষ-সমীরে আর তাঁহার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠে না। সিরাজনগরী আজ ধ্বংসের মলিনতায় ধূসরিত—তাহার সে গৌরবের দিন আর নাই, অতীতের স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া ধ্বংসের অবশেষ বক্ষে ধরিয়া সিরাজ আজ নিদ্রিত। কিন্তু সিরাজের সেই ধ্বংসস্তূপের উপর, সিরাজের দৈন্যজনিত মলিনতাকে দূরে সরাইয়া হাফেজের অমর স্মৃতি বিরাট অভ্রভেদী মনুমেন্টের ন্যায় আজো দাঁড়াইয়া আছে! কালের প্রলয়ঙ্কর সহস্র তরঙ্গাঘাতকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া উহা আপনার গৌরবে আপনি দেদীপ্যমান! আর সভ্য জগৎ তাহার চরণতলে নিত্য ভক্তিনৈবেদ্য উপহার দিতেছে। যদিও আজ রোকনাবাদের কূলে বসিয়া প্রকৃতির শিশু হাফেজ তটবিহারী সমীরণকে সম্বোধন করিয়া বলেন না—

মম বঁধুয়ার মঞ্জু কাননে হে অনিল যদি বহিবে,
পায়ে ধরি তব, প্রাণেশে আমার প্রেমের বারতা কহিবে;[১]

যদিও সান্ধ্যপ্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী অপূর্ব ভঙ্গিমায়, সান্ধ্য-আকাশের নীলিমায় আত্মহারা হইয়া আর কেহ গাহে না—

ওগো, ওই চাহনিতে বিশ্ব মজেছে ঝরিয়াছে কত অশ্রুধার;
মোরে, পাগল করেছে ঐ মত্ত আঁখি কুলমান রাখা হইল ভার।[২]

যদিও হাফেজের শেষ চিহ্ন অনন্তের তরে পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই নির্ঝরের তীরে, উদ্যানের মাঝে, মর্মরখচিত সমাধির দিকে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে অনিল-নিস্বনে গীত হইতেছে—হাফেজ মরেন নাই। তাঁহার অপার্থিব সঙ্গীত তাঁহার জৈবকণ্ঠ পরিহার করিয়া আজ সহস্র নরনারীর কণ্ঠে-কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। হাফেজের ভগবৎপ্রেম, হাফেজের দার্শনিক চিন্তা, হাফেজের ভাবুকতা, বিশ্বসাহিত্যে অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছে। হাফেজ কোন্ কালে জন্মিয়াছিলেন—এই সুদীর্ঘ সাতশত বৎসরে, এই নব সভ্যতার আলোক-উদ্ভাসিত যুগেও তেমন গভীর ভাবপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যগ্রন্থ দুই-চারিখানির অধিক রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যক্ষেত্রে হাফেজের এই স্বাতন্ত্র্য, এই অসাধারণত্ব তাঁহার ধর্মজগতে সিদ্ধিলাভের ফল। সাধকের প্রাণের কথা বলিয়াই, দেখ রামপ্রসাদের ক্ষুদ্রকাব্য আজিও বাঁচিয়া আছে ও বঙ্গের গৃহে গৃহে আদৃত ও গীত হইতেছে। কত গানই তো বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে, কিন্তু গভীর নিশীথে যখন শুনি—

তুই কেমন মা তা কে জানে—

তখন সেই শাদা সুরে প্রাণটি যেমন আকুল হইয়া উঠে, তেমন আর কোন্‌টিতে হয়? তাই বলিতে হয় হাফেজে যে-কবিপ্রতিভা ফুটিয়াছিল উহা দৈবশক্তির এক অভিনব বিকাশ। সিদ্ধ তাপস রুমীর ভাষায় বলিতে গেলে—

দো নাহান্ দারেম গোইয়া হাম চুঁ নায়—

---

[১] আয় বাদ আগার বগোলসানে আহ্‌বাব বোগোজারি
যেন্‌হার আরজা দে বজান পায়ামে মা।—(হাফেজ)

[২] কাছ্‌ব'দওরে নরাগাস্ত্ তর্‌ফে নিস্ত্ আজ আফিয়াৎ
বেহ্‌কে বো'ফরুশন্দ মস্তরী ব'মস্তানে শর্মা। (হাফেজ)

অর্থাৎ কবির প্রাণ বাঁশি মাত্র; উহার এক প্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের অধরে, অন্যপ্রান্ত এই বিশ্বমানবের নিকট স্বর্গীয় সুরে অপূর্ব অশ্রুত সঙ্গীতের আলাপন করে! আর পাপ-তাপ-দগ্ধ-মানব এই সংসার-মরুতে সেই অমৃত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে।[১]

জীবন

"Some with a smoke begins but ends in light."

—Addison.

হাফেজের জন্ম ও বাল্যজীবন অতীতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের রাজধানী সিরাজনগরে তাঁহার জন্ম হয়। কোন্ শুভ্র প্রভাতে তাঁহার জন্মোৎসবের অনাড়ম্বর মঙ্গলধ্বনি সসঙ্কোচে বাজিয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাস তাহা লক্ষ করে নাই। কোন্ ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া উষার নীরবতা ও সাঁঝের কোলাহল তাঁহার হৃদয়কুসুমকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়াছিল, তাহাও এযাবৎ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের গোচরে আইসে নাই। এইরূপ কত মহাপুরুষই-না নবজাত কুসুমের ন্যায় নীরবে প্রস্ফুটিত হইয়া নীরবে ঝরিয়া গিয়াছেন; জগৎ শুধু দুই-একটির সন্ধান রাখে মাত্র। হাফেজের তিনশত বৎসর পর ইংলন্ডের যে দুরন্ত বালক রাজকীয় উদ্যানে মৃগয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দেশত্যাগী হন ও উত্তরকালে সমগ্র নাট্যসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট পদে বরিত হন, তাঁহারও বাল্যজীবন অতীতের ছায়াপথ হইতে কখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

শিশুর বদনে প্রতিভার লক্ষণ দেখিয়া পিতামাতা শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন শাম্‌স্-উদ্দিন। প্রকৃতই (কবিকুলে) তিনি সূর্যস্বরূপ ছিলেন। হাফেজের পিতামাতা সৌধবাসী না হইলেও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, এ-কথা হাফেজের সমুচিত শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত হইতে অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি কোনো জীবনস্মৃতি রাখিয়া যান নাই। কোন্ ফুলটি তাঁহার ভালো লাগিত, কোন্ পাখির কূজন-গীতিতে তাঁহার প্রভাত নিদ্রা অপসারিত হইত—প্রভাতের কোন্ রাঙা আলো তাঁহার নয়ন-কোণ হইতে স্বপ্নের ছবি অপসারিত করিয়া প্রকৃতির হাস্যময়ী ছবিকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিত, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাদ্‌লা দিনে গলিপথে বৃষ্টিঘেরা ছাতা দর্শনে গুরুমহাশয়ের আগমন সম্ভাবনা করিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিতেন কিনা[২] জানি না। "I knew him well and every truant knew"[৩] বলিয়াও তিনি শিক্ষকের সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। শুধু জানা যায়—তিনি শৈশব হইতে অত্যন্ত মেধাবী, পাঠাসক্ত ও চিন্তাশীল ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে বহু বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভে করিয়াছিলেন। দিনদিন যেমন হাফেজের প্রতিভার স্ফুরণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদিতেও সবিশেষ ব্যুৎপত্তি হইয়া উঠিলেন। মরমীসাহিত্যে (mysticism) তাঁহার

---

১. হাফেজের নাম প্রত্যেক বঙ্গ সাহিত্যিকের নিকট পরিচিত কিন্তু এ পরিচয় তাঁহার মূল কাব্য দ্বারা নয়—তদীয় কাব্যের অনুবাদ দ্বারা। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত তাঁহার সমগ্র কাব্যের যথার্থ অনুবাদ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যে কৃষ্ণচন্দ্রের সম্ভাবশতককে হাফেজের অনুবাদ বলিয়া মনে করি, উহা আমাদের ভ্রম। উহার কোনো কবিতাই হাফেজের প্রকৃত অনুবাদ নহে—শুধু তাহার ভাব লইয়া লিখিত।

২. রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি।

৩. অলিভার গোল্ডস্মিথ।

একাধিপত্য ছিল। হাফেজের কাব্য উচ্চ অঙ্গের দর্শনে পরিপূর্ণ। যৌবনে তিনি এক সিদ্ধ তাপসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং এইরূপে অল্প বয়সেই 'সুফি' সমাজে প্রবেশ করেন।

ক্রমে হাফেজের কবিত্বের কথা সমগ্র পারস্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এই সময় তিনি সিরাজের রাজমন্ত্রী গুণগ্রাহী হাজি কেওয়ামের আশ্রয় লাভ করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ হাফেজ নিজের অমর কবিতায় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।[১] কিন্তু হাফেজ শান্তির পিপাসু ছিলেন; রাজসভায় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর তাঁহার ভালো লাগিল না। তিনি ইহার ভিতর কোনো মাধুর্য খুঁজিয়া পাইতেন না। তাই যখন বাগদাদের মহিমান্বিত খলিফা সুলতান আহ্‌ম্মদ তাঁহাকে আপনার সভায় আহ্বান করেন, তখন তিনি এক অপূর্ব কবিতা পাঠাইয়া সসম্ভ্রমে তদীয় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে উক্ত খলিফা কবির নিজ আবাসেই আপনার দেয় উপহারগুলি পাঠাইয়া কবিত্বের সম্মান করিয়াছিলেন।[২]

হাফেজ কদাচিৎ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতেন। একদা তিনি কোনো কার্য উপলক্ষে বিদেশ যাত্রাকালে যে-উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতায় হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করেন[৩] তদৃষ্টে মনে হয় তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে আদৌ ভালোবাসিতেন না।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহম্মদ কাসেম (ফেরেস্তা) লিখিয়াছেন—হাফেজ একবার দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। মহম্মদ শাহের দানশীলতা, সৌজন্য ও গুণগ্রাহিতার কথা দুরূহ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া সুদূর পারস্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া হাফেজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পাথেয় অভাবে তাঁহার ইচ্ছা অনেকদিন কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। ক্রমে এ-কথা যখন বাহ্‌মনী মন্ত্রী মীর ফয়জুল্লা আন্‌জুর কর্ণগোচর হইল, তিনি তখন কবির পাথেয়স্বরূপ বহু স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহাই লইয়া কবি পরিশেষে পদব্রজে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কবি চলিয়াছেন। কত নদ-নদী, গিরি-প্রান্তর, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কবি চলিয়াছেন। হৃদয়ের ভিতর আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত; বাহিরে প্রকৃতির অভিনব বৈচিত্র্য। কবি ভাবেন—কল্পনার নয়নে আঁকিয়া দেখেন, বাহ্‌মনী রাজ্যের বিরাট ছবি। কত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, কত সৌধমালা, দুর্গ-প্রাকার ও উদ্যানরাজি সেখানে শোভা পাইতেছে। আর সর্বোপরি সকলকে ঘেরিয়া, সেই সোনার ভারতের সোনার মাঠ না-জানি কত সৌন্দর্য বিতরণ করিতেছে! ভাবিয়া ভাবিয়া কবি উৎফুল্ল হইতেছেন। কোথাও বিস্তীর্ণ জনপদ ও দূর প্রসারিত প্রান্তর বহুদূরে অস্পষ্টতায় মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও বিশাল বনভূমি অনুদ্ঘাটিত রহস্যজাল বক্ষে চাপিয়া দূর পথিকের মনে অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও-বা তুঙ্গশীর্ষ-পর্বতমালা মেঘরাজের তটভূমিতে মস্তক রাখিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে ও প্রকৃতি তাহার পার্শ্বে মানবের ক্ষুদ্রতাকে অধিকতর ক্ষুদ্র করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাবে কবির হৃদয়ে না-জানি কতই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কবি গাহিয়াছেন—

---

[১] "দরিয়ায়ে আখ্‌জারে ফালাক্‌ ও কাশ্‌তি এ হেলাল
হাস্তান্দ পোর্‌কে নে'মতে হাজি কেওয়ামে মা।"—(হাফেজ)

[২] কথিত আছে ইনি একজন অসাধারণ বিদ্বান ও পারদর্শী চিত্রকর ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইঁহারই সময় প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ বাগদাদ আক্রমণ করেন।

[৩] "মা বেরাফ্‌তেম তু দানি ও দেলে গম্‌খোরে মা;
বখ্‌তে বদ্‌-তা ব কোজা মী বোরাদ আবখোরে মা।"—(হাফেজ)

"আহা কিবা শোভাময় এ ভব ভবন,
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।"

*　　*　　*

"যে করেছে কোনোদিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন।"

*　　*　　*

"এসব স্বভাব শোভা রচিত যাঁহার
হাফেজ মজো-না কেন প্রেমরসে তাঁর।"

*　　*　　*

"দয়া করে দিলা যিনি দুইটি নয়ন
উচিত কি নয় তাঁর রূপ দরশন?"(সদ্ভাব শতক)

একদিকে যেমন প্রকৃতির এই সকল সৌন্দর্য-কলা কবির চক্ষে আনন্দদায়ক ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিশাল মরুভূমির দুস্তর করাল-মূর্তি, বন্ধুর দুর্গম পার্বত্যপথ, ঝটিকা বৃষ্টির চপলা—চকিতা সংহারিণী-লীলা—এ সকলই তাঁহার পক্ষে বিষম সন্ত্রাসক ছিল। এইরূপে কত রমণীয় উদ্যান ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কত স্বচ্ছ প্রস্রবণ ও বন্ধুর গিরিপথ পশ্চাতে রাখিয়া কবি পারস্যের সীমান্তে উপনীত হইলেন। পামীরের উন্নত-শীর্ষ তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। উপত্যকা ও অধিত্যকার নৈসর্গিক শোভা তাঁহার প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল। তিনি পরিপূর্ণ প্রাণ লইয়া খাইবারের গিরিমূল দিয়া পাঞ্জাব-বক্ষ-আশ্রিত পুণ্যতোয়া সিন্ধুর তটভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

বিশাল সিন্ধু গভীর কলনাদে সাগরের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। শুষ্ক পাঞ্জাবের তৃষিত-বক্ষ সুশীতল করিয়া, উভয়তট শস্যশ্যামলা করিয়া পঞ্চ সহচরীর আলিঙ্গনবিভোর সিন্ধু মহাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দৃশ্যে কবির জন্মভূমির ক্ষুদ্রনদী রোকনাবাদের কথা মনে পড়িয়া থাকিবে। মাইকেলও একদিন ক্ষুদ্র কপোতাক্ষীর কথা স্মরণ করিয়া সুদূর ফ্রান্স হইতে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। হরিষে-বিষাদে ভবিষ্যতের কল্পনা ও অতীতের স্মৃতিতে ডুবিয়া কবি সিন্ধুতীরে বিশ্রাম করিতেছেন, অকস্মাৎ তাঁহার এক বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই দূরদেশে অনেক দিনের পুরাতন বন্ধুর দর্শনে তাঁহার প্রাণে পুলকের সঞ্চার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বন্ধুর দুর্দশা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি প্রাণে দারুণ দুঃখ অনুভব করিলেন। শুনিলেন ভারত হইতে পারস্য অভিমুখে ফিরিতেছেন, এমন সময় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া এই বন্ধুটির সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। তাই তিনি এখন নিরুপায় হইয়া অনাহারে অনাশ্রয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! স্বদেশ গমন দূরে থাকুক—এই কপর্দকহীন পথিকের এখন জীবনধারণ করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আজ তাঁহাকে এই অজ্ঞাতবাসে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে—এই ভাবিয়া বিপন্ন পথিক আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! আর্তের কাতর-নয়নে অশ্রু দর্শনে হাফেজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় গলিয়া করুণার বেগবতী মন্দাকিনীর সৃষ্টি করিল। কবি আত্মবিস্মৃত হইলেন। সঙ্গে পাথেয়স্বরূপ যাহা ছিল সমস্তই বন্ধুকে দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। বন্ধু অর্থ পাইয়া নবজীবন লাভ করিলেন। সাশ্রু-নয়নে গদগদকণ্ঠে হাফেজকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি আবার পারস্যের পথে যাত্রা করিলেন।

আর হাফেজ! হাফেজের কী হইল! পরদিন প্রভাতে হাফেজ যখন বুঝিলেন তিনি কপর্দকহীন, তখন তাঁহার দাক্ষিণাত্যে যাইবার সকল সাধ, সকল আশা তিরোহিত হইল। এখন এ বিদেশে তাঁহার জীবন ধারণের উপায় কী? উপায় না থাকিলেও কবি অনুতপ্ত হইলেন না। বিধাতার উপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অপূর্ব ধীরতা ও শান্তি সহকারে বলিলেন—'খোদা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মানুষ অন্ধ, তাই বালির বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হয়; সে জানে না বিশ্বনিয়ন্তার শক্তির নিকট তার ক্ষুদ্র ইচ্ছা কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য!' কপর্দকহীন হাফেজ সিন্ধুতীরে বসিয়া বিধাতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কিন্তু হাফেজের অধিক দিন কষ্ট করিতে হয় নাই। যিনি সকল কারণের মূলসূত্ররূপে অন্তরালে থাকিয়া আর্তের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন, বিপন্নের উদ্ধারের জন্য মানবের প্রাণে ব্যাকুলতা ঢালিয়া দেন, জ্ঞানের অতীতে থাকিয়া ব্যথিতের আঁখিজল মুছাইয়া দেন, বুদ্ধির পরপারে বসিয়া হতাশের প্রাণে আশার আলো ছড়াইয়া দেন, সেই 'সুসময়ে উপেক্ষিত' অসময়ের বন্ধু খোদা হাফেজের আকুল আহ্বানে সাড়া দিলেন। হাফেজ কোনোক্রমে লাহোরে উপনীত হইলেন এবং তথায় দুই সহৃদয় পারসি বণিকের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ইঁহাদের নাম খাজা জয়নাল আবেদিন ও খাজা মোহাম্মদ। লাহোরের পথপ্রান্তে হাফেজ রত্নকে কুড়াইয়া পাইয়া তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। হাফেজ ইঁহাদের সাহায্যে নৌকাপথে পারস্য উপসাগরে উপনীত হইলেন। সৌধ-শোভিত ক্ষুদ্র হুরমুজ নগর পারস্য উপসাগরের তীরে শোভা পাইতেছে। এখানে এখন হাফেজের বাস।

অন্তহীন বিস্তৃতির বক্ষ দলিয়া সাগরের তরঙ্গরাশি হুরমুজের উপকণ্ঠে আসিয়া প্রতিহত হইত। ফেনিল আবর্তের উপর তটাহত তরঙ্গমালা শতধা বিভক্ত হইয়া মূর্ছিয়া পড়িত। ভীষণ জলকল্লোল নির্বিকার মহাকালের ন্যায় এই হতাহত তরঙ্গসমষ্টির উপর দিয়া আপনার বিজয়-ভেরি বাজাইয়া যাইত। হাফেজ সে-দৃশ্যে তন্ময় হইয়া যাইতেন। যেন—'কী সঙ্গীত ভেসে আসে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে।' হাফেজের যেন—'ভেসে যেতে চায় মন ঐ কিনারায়'। হাফেজ এই অভিনব লীলা দর্শনে ইহার স্রষ্টাকে অভিনব উপায়ে ধারণা করিতেন। সান্ধ্য-গগনে তারা ফুটিত—ধীরে বীচিমালার লহর বহিয়া সান্ধ্য-সমীরণ ভাসিয়া আসিত—হাফেজের চিন্তাক্লিষ্ট মন তাহাতে শীতল হইত। হৃদয়-মন প্রফুল্ল করিয়া হাফেজ রজনীতে সমাধিস্থ হইতেন; রাত্রি যতই গভীর হইত, হাফেজ ততই গভীর হইতে গভীরতর ধ্যানে আপনাকে হারাইয়া বসিতেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে তাঁহার সহগামী বণিকদ্বয় পোত সহযোগে ভারতাভিমুখে যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। হাফেজ ভারতদর্শনে পুনরায় জলপথে যাত্রা করিলেন। জাহাজে নোঙর তুলিল—শ্বেতপক্ষ বিস্তার করত সহস্র তরঙ্গ পদদলিত করিয়া ভারতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু প্রকৃতির চক্ষে এ দম্ভ সহিল না। যাত্রার কয়েকদিন পরেই ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইল। অগণিত অসুরের বল লইয়া কোটি কোটি তরঙ্গ সাগরবক্ষে মস্তক উত্তোলন করিল। তাহাদের মদগর্বে সাগরবক্ষ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। মহাবাত্যা উন্মাদের ন্যায় জাহাজখানি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল; আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া জাহাজখানিকে পিণ্ডের ন্যায় লুফিয়া লইতে লাগিল। হাফেজ প্রমাদ গণিলেন!

ইতিপূর্বে হাফেজ আর কখনো সমুদ্রযাত্রা করেন নাই। এ সময়ে তাঁহার ভীষণ কষ্ট হইতে লাগিল। কোথায় প্রভাতসূর্যের অলক্তধারায় সাগরবক্ষে গলিত-সুবর্ণের প্রবাহ দেখিয়া পুলকিত হইবেন; কোথায় অগণিত তরঙ্গপুঞ্জের মাঝারে অস্তায়মান রবিখণ্ডকে

খসিয়া পড়িতে দেখিবেন ও অনন্ত বিস্রস্ত বারিধিকে খোদার সিংহাসন চুম্বন করিতে দেখিয়া সেই নিত্য সনাতনকে স্মরণ করিবেন—আর এখন মহানিশার করাল গ্রাসে বিশ্বসংসার সংক্ষুব্ধ; তরঙ্গের তাণ্ডব নর্তন; প্রলয়ের অশনি গর্জন; যেন কোনো রুদ্র শক্তি বিশ্বের সংহারের ব্যবস্থা করিতেছে—আকাশের তারকা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, উর্ধ্বের মেঘমালা ছিন্নভিন্ন করিয়া জলধিগর্ভে বিসর্জন দিতেছে; গ্রহ উপগ্রহ কক্ষচ্যুত করিয়া মর্ত্যের পানে ছুড়িয়া ফেলিতেছে। হাফেজ ভাবিলেন—এ আবার লীলাময়ের কোন্ মূর্তি।

প্রাণের আশঙ্কায় হাফেজের হৃদয় হইতে ভারতভ্রমণের অভিলাষ তিরোহিত হইল। হাফেজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর জাহাজ পারস্যের এক বন্দরে আশ্রয় লইলে হাফেজ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া জনৈক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। ঝটিকার অবসান হইলে জাহাজ আবার বন্দর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু হাফেজ আর আসিলেন না। তিনি লোক মারফৎ এক মনোহর গীতিকবিতা উক্ত খাজা ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায়ের উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। হাফেজের ভারত-ভ্রমণ পর্বের এইখানেই যবনিকা পতন হইল।

ঐতিহাসিক ফেরেস্তা বলেন—দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী সুলতান এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মেশেদ নগরের অধিবাসী মোল্লা মহম্মদ কাশেমের দ্বারা হাফেজের নিকট উপহার পাঠান।

কবি

যে-সময় স্পার্টার বিজয়ী বীর লাইস্যান্ডার পদানত এথেন্সের দুর্গ-চত্বরে বসিয়া উক্ত মহানগরীর ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কবি ইউরিপাইডিসের রচিত সঙ্গীতের একটি করুণ মূর্ছনায় কিরূপে তাহার সমগ্র পরিষৎ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন ও কিরূপে কবির সম্মানার্থ তদীয় বীণা-স্পর্শপূত জন্মভূমির সম্মানার্থে তাঁহারা গ্রিসের তোরণদ্বার হইতে আপনাদের সংহার-আজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লন, তাহা বোধহয় পাঠকের অবিদিত নাই।[১] দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার থিবস অধিকার করিয়া লুণ্ঠনরত সৈন্যদের হস্ত হইতে কিরূপে মহাকবি পিন্ডারের গৃহ সুরক্ষিত করেন তাহাও হয়তো ঐতিহাসিক পাঠকের স্মৃতির নিভৃত প্রদেশে আজো জাগরূক রহিয়াছে।[২] বিশ্বমানব যাঁহাদের প্রদত্ত পীযূষধারা পান করিয়া মর্ত্যে অমৃত্যের স্বাদ অনুভব করে—কোটি মানবের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা, লক্ষ নগরীর স্থাপয়িতা ও সংহারকর্তা বিজয়ী বীরও তাঁহার মহিমার নিকট মস্তক নত করে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বিরল নহে। আজ তাহারই একখানি প্রাচ্যদেশীয় চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

যে দুরার্ধর্ষ তৈমুরের বিশ্ববিশ্রুত নামে ভারতের নরনারী আজিও কম্পিত হয়, ভূমধ্যসাগর হইতে চিনের পশ্চিম সীমা ও সাইবেরিয়া হইতে উত্তর-ভারত পর্যন্ত যাঁহার বিজয়-বাহিনী রক্তের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল, তিনি পারস্য জয় করিয়া আজ সিরাজের দরবারে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শাহ্ মন্‌সুর নিহত হইয়াছেন—সমগ্র নগরী বিজয়ী

---

১. প্লুটার্কের মতে Lysander the Lacedaemonian General খ্রি. পূ. ৪০৪ সনে এথেন্স জয় করেন এবং নগরীকে ধূলিসাৎ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিজয় উৎসবের ভোজসভায় Euripides-এর গ্রন্থ Electra হইতে কয়েকটি সুমধুর ছত্র গীত হইলে বিজয়ীগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের এই মত পরিবর্তন করেন।

২. প্লিনির মতে Alexander the Great খ্রি. পূ. ৩৩৩ অব্দে Thebes অধিকার করেন।

সৈন্যের তাণ্ডব-উৎসবে পর্যুদস্ত। এমনি যখন অবস্থা, উৎকণ্ঠায় যখন 'একটি প্রাণীর আর নাহি বহে শ্বাস' এমন সময়ে রাজদরবারে কবি হাফেজের ডাক পড়িল। হাফেজ তাঁহার এক আধ্যাত্মিক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

আগার আঁ তোর্কে সিরাজ বদস্ত্ আরাদ দেলে-মা'রা
বখালে হেন্দুয়াস্ বখ্শাম্ সমরকন্দ্ ও বোখারা রা।

অনুবাদ—

প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরি সে তুর্কি সোওয়ার মন্‌চোরা,
প্রিয়ার মোহন চাঁদ কপোলে
একটি কালো তিলের তরে—
দেই বিলিয়ে সমরকন্দ্ ও রত্নখচা এই বোখারা।

তৈমুর তাঁহার জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কবি, যে সমরকন্দ ও বোখারা আমার জন্মভূমি, যাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই সুদীর্ঘকাল তৈমুরের কোষমুক্ত তরবারি প্রাচ্য মহাদেশের কত বিশাল রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছ—কত নরনারীকে বন্দি করিয়া সমরকন্দের রাজলক্ষ্মীর চরণতলে উপহার দিয়াছে, কত অসংখ্য জনপদ লুণ্ঠন করিয়া যাহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে, সেই সমরকন্দ ও বোখারা কি এতই তুচ্ছ যে তুমি উহা তোমার প্রিয়ার কপোলের সামান্য একটু তিলচিহ্নের পরিবর্তে অকাতরে বিলাইয়া দিতে চাও! সভাস্থল প্রকম্পিত হইল, দিঙ্‌মণ্ডল সসম্ভ্রমে সে-কথার প্রতিধ্বনি কুড়াইয়া সভাতলে উপহার দিল। সকলে স্তম্ভিত! তৈমুরের কটিদেশে শাণিত অসি দোদুল্যমান। বিশাল আঁখি হাফেজের উপর বিন্যস্ত। তিনি হাফেজের উত্তরের প্রতীক্ষায় আছেন।

হাফেজ অকুতোভয়ে, ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—এমনি দানই তো হাফেজকে আজ পথের ভিখারি করেছে, সম্রাট!

সত্যই হাফেজ যদি প্রেমাস্পদের জন্য সংসারকে তুচ্ছ ধূলিরাশির ন্যায় জ্ঞান না করিত, তবে সে সৈন্যকে বরণ করিয়া এত সুখ পাইত না—বিশ্ববিজয়ী বীর আজ তাঁহার চরণতলে সোনার মুকুট নত করিত না। তৈমুর হাফেজের এই সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও এই সরস উত্তরে যারপরনাই প্রীত হইলেন। অবিলম্বে হাফেজের দেহ রাজকীয় ভূষিত ও অঞ্জলি মণিমুক্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কবিদিগকে অনেক সময় রাজরাজন্যের নিকট অকারণ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। হাফেজ, একদা শেখ আবু এস্‌হাক নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্তুতি-গাথা রচনা করেন বলিয়া আবু এস্‌হাকের শত্রু শাহ্ সুজা[1] হাফেজকে বিষ-নয়নে দেখিতেন। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া তিনি হাফেজের উপর প্রতিশোধ লইতে মানস করেন। ছিদ্র অন্বেষণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইল না। হাফেজ তাঁহার সুরাধর্মের মাহাত্ম্য গাহিয়া তাঁহার কোনো এক আধ্যাত্মিক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

ধরমের নামে যে বাণী গাহিল
হাফেজ, তা যদি ধরম হয়;
তবে, অটুট হউক আজিকার দিবা
কালি বা এ সুখ নাহিকো রয়![2]

---

[1] এব্‌নে মজাফ্‌ফরের পুত্র। এই এব্‌নে মজাফ্‌ফরই আবু এস্‌হাককে নিহত করেন।

[2] গর মুসলমানী আয আন্ আস্তে কে হাফিজ দারাদ
ওয়ায়! আগার আজ পায় এমরোজ বুয়াদ ফারদায়ে।

বলা বাহুল্য হাফেজের সুরা প্রেমের উম্মাদনী-মদিরা। কিন্তু সুজা এই কবিতা পাঠ করিয়া হাফেজকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও দণ্ডের জন্য বিচারে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হাফেজ তখন ঐ ছত্রের পূর্ববর্তী ছত্রটি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং তাহার যোগে কবিতার অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। হাফেজ মুক্তি লাভ করিলেন। উক্ত ছত্রটি এই :

সখি—আজি এ প্রভাতে কী মধুর আহা
সে সঙ্গীত কানে বাজিল রে,
যাহা মদিরা দুয়ারে খ্রিস্টিয়ান সাকি
ঢাক্ বাঁশি দিয়া গাহিল রে।[১]
সে, ধরমের নামে যে বাণী গাহিল,
হাফেজ তা যদি ধরম হয়,
তবে, অটুট হউক আজিকার দিবা,
কালি বা এ সুখ নাহিকো রয়!

প্রেম হাফেজের কবিতার প্রাণ, মদিরা সে কবিতার স্বাভাবিক ভূষণ। যে মানসপ্রতিমার ছায়া হাফেজ আকাশের নীলিমায়, বসন্তের সুষমায় অনুভব করিতেন, তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই বাঞ্ছিতের প্রতি আকুল অনুরাগ বিচ্ছুরিত হইতেছে। ভাবের এই প্রাবল্য, বর্ণনার এই নিবিড়তা, এই সকল দেখিয়া অনেকে মনে করেন—হাফেজের মানসপ্রতিমা শুধু তাঁহার মনোরাজ্যেরই সৃষ্টি নহে, উহা তাঁহার প্রাণের পথে সেই ইন্দ্রিয়াতীতেরই কেবল আনাগোনার ফল নহে; পক্ষান্তরে বাস্তব জগতে এমন কোনো রক্তমাংসের প্রাণী ছিল যাহা হাফেজের প্রাণে এই উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যর উইলিয়ম জোন্স বলেন—অনেকের মতেই হাফেজের কবিতা শুধু আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নহে, কেননা তিনিও মানুষ ছিলেন—মানুষের মনোবৃত্তি হইতে তিনি মুক্ত থাকিবেন কী প্রকারে? কথিত আছে, যৌবনে তিনি এক কিশোরীর প্রতি একান্ত প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। এই বালিকার নাম সাখেনাবাত (The Branch of the sugar-cane) কিন্তু কে সে বালিকা, কোথায় তাহার বাস, কিছুই জানা যায় না।

দিউয়ান

হাফেজের দিউয়ান বা কবিতাগুচ্ছ কাব্যজগতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উহার গজল গানগুলি যেন প্রেমের এক-একটি ফুল শতদল। একটি ভাবোন্মত্ত হৃদয়ের উৎসারিত আবেগরাশি যেন জমাট হইয়া এই গীতি-কাননের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যে বিরাট হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই গীতিলহরির উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়ই এই দিউয়ানেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। তাই এই গজল গানগুলির রচয়িতার নিকট উহাদের তেমন আদর ছিল না। হাফেজ স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁহার রচনাগুলি সংগৃহীত করিয়া যান নাই। জনপ্রিয় গজল হিসাবে লোকের মুখে-মুখে সেগুলি গীত হইত, তাই কালের আঘাত সহিয়া উহারা বাঁচিয়া ছিল। হাফেজের মৃত্যুর পর তদীয় বন্ধু গুল্‌আন্দাম সেগুলির সংগ্রহ ও সংকলন করেন। যতগুলি সংগৃহীত হয় তাহার সংখ্যা পাঁচশতেরও অধিক। অসংগ্রহীতের সংখ্যা কেহ জানে না।

---

[১] ঈঁ হাদিসম্ চে খোশ আমদ-কে শহরগাহ মীগোফ্‌ত্
বর দারে মায়কাদায়ে বা দফ ও নায় তরসারে।

হাফেজের কবিত্বের বিশালতা সাগরবারির ন্যায়। সাগরের মতোই উহা অতলস্পর্শী এবং রত্নগর্ভ। সন্ধানীর নিকট দিউয়ান ভাবরাজ্যের অমূল্য সম্পদ। দিউয়ানের একমাত্র সুর প্রেমোন্মত্ততা। প্রেমের আবেশেরই নাম কবি লিখিয়াছেন শরাব। আর প্রেম যিনি কবির হৃদয়ে সিঞ্চিত করেন সেই মোর্শেদ হইল তাঁহার সাকি। সাকি ঝলকে ঝলকে ভাবপিয়াসীদের ভুখা হৃদয়ে প্রেমাবেশের তীব্র সুরা ঢালিতে থাকেন আর তাহারা উহা আকণ্ঠ পান করিয়া তর্ ও মস্ত্ হইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্যের অপূর্ব আনন্দ ও মত্ততা উপভোগ করিতে থাকেন। তাই কবি মোর্শেদকে কখনো সাকি, কখনো বুলবুল, এইরূপ নানা প্রিয়-সম্ভাষণে অভিহিত করেন। প্রেমের পথিক কবির মোর্শেদ ভিন্ন কথা নাই; কারণ মোর্শেদ ব্যতীত তাঁহাকে অমৃতের সন্ধান দিতে আর কেহ পারে না। তাই অতি নিঃসঙ্কোচ নির্ভরের সহিত কবি তাঁহার মোর্শেদের শরণ লইয়াছেন। তাঁহার কথাই হইল—

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোন্
গারাৎ পীরে মোগাঁ গোইয়াদ
কে ছালেক বেকবর না বুয়াদ
যে রাহ ও রেছ্মে মন্জেল্হা।

অর্থাৎ পীর যদি বলেন, জায়নামাজ মদিরসিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কেননা পথ ও পথের রেওয়াজ সম্বন্ধে তিনি অনবধান নহেন। প্রেমোন্মত্ত কবি সময়ে কল্পনার উচ্চতর লোকে উঠিতে উঠিতে তাহার মোর্শেদেরও মোর্শেদ সেই আল্লাহকে সম্মুখে অনুভব করেন যেন এক ঈপ্সিত প্রেমিকারূপে। উষার উন্মেষে কবি দেখিতে পান, যেন সেই প্রণয়রানির কৃষ্ণ অলকদাম অল্পে অল্পে অপসারিত হইতেছে, আর তার অন্তরাল হইতে প্রিয়ার হেমোজ্জ্বল বদনকান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভাত-শিশির যেন সেই প্রিয়ারই কুন্তলক্ষরিত বারিকণা। সমীরণ ছুটিয়া চলে যেন সেই কল্পরানির প্রেমোদ্যানে ব্যজন করিতে। আর কবি তাহার মারফতে প্রবাসী যক্ষের ন্যায় আপন প্রণয়-বারতা নিবেদন করিয়া পাঠান। চন্দ্রতারকাখচিত আকাশ হইতে সৌন্দর্যের সুধাধারা উছলিয়া পড়িতে থাকে। নৃত্যপরা ধরণীর তালে তালে কবি প্রকৃতির সঙ্গীত শুনিতে পান। আর ভাবোন্মত্ত হৃদয়ে উল্লাসে গাহিয়া উঠেন : ঢালো সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা, শরম আছে কি তায়।

সাধক কবি যখন ভাবাবেশে তন্ময় থাকেন তখন তিনি রাজাধিরাজ। পার্থিব কোনো চিন্তা বা কামনা তখন আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তখন তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ। হাফেজ বলিতেছেন—

কনুন কে মী দমদ আয বুস্তনে নছীমে বেহেশ্ত
মান্ ও শারাবে ফেরাহ্–বখশ ও ইয়ারে হুর–ছেরেশ্ত;
গাদা চেরা না যানাদ লাফে ছোলতানাৎ এম্রোজ
কে খীমা ছায়ায়ে আরব আস্ত ও বজ্মগাহ লাবে কেশ্ত।
চুন্ বেখোদ গাশ্ত হাফেজ কায় শোমারাদ
ব'ইয়াক্ জও মেল্কাতে কাউচ ও কায়রা!

—আহ্ কী সুন্দর বেহেশ্তি দখিন হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে! সেই সঙ্গে চিত্তপ্রফুল্লকারী মদিরা আর হুর-চেহারা সখা (মোর্শেদ)! কী মধুর মিলন! ভিখারি (হাফেজ), কেন এখনো শাহি দর্পে হুঙ্কার দিতেছ না? আজ-যে মেঘমালা তোমার তাঁবুর ছাদ আর মুক্ত প্রান্তর তোমার দরবার-ভূমি! হাফেজ যখন আবেশে আত্মহারা হয় তখন সে কায় ও কাউছের বিশাল সাম্রাজ্যকে এক যব সমানও মূল্যবান মনে করে কি?

আবার ভাবাবেশে যখন ভাটা আসে কবি তখন একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। সুখানুভূতির ক্ষণিক অভাবও তাঁহার অসহ্য বোধ হয়। তিনি তখন তাঁহার জোয়ারের উৎস মোর্শেদের পুনঃশরণাপন্ন হন। হাফেজ বলিতেছেন—

আলা'ইয়া আইওহা সাকি, আদের কাছা ও নাবেল হা,
কে এশ্‌ক আছাঁ নমুদ আভিয়াল, ওয়ালে ওফ্‌তাদ মোশ্‌কেল হা।

—হে সাকি, পেয়ালা দ্রুত চালনা কর। প্রেম প্রথম বড় সহজ মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন বড়ই মুশকিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১]

প্রেমাস্পদের অদর্শনে বিরহকাতর কবির যে-বিলাপ তাহা নিঃসহায় বালকের ক্রন্দনের ন্যায়ই অকপট ও করুণ।

তা রাফ্‌ত মা রা আয নজর আঁ চশ্‌মে জাহাঁ বীন
কাছ্ ওয়াকেফে মা নিস্ত কে আয দীদা চাহ্‌হা রাফ্‌ত

—সেই বিশাল আঁখিদুটি যেই আমার দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইয়াছে, সেই হইতে আমার নয়নকূপ যে প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে কেহ তাহার খবর রাখে কি?

আবার প্রেমাস্পদের পুনরাবির্ভাবে তেমনি কবির আনন্দ সকল সীমা, সকল বাধা ছাড়াইয়া যায়। সে এমনই এক সবেগ তন্ময়তা যে তাহার সম্মুখে কবি তাঁহার আত্মজীবনেরও কোনো মমতা করে না। হাফেজ একদা উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

তা'লা ল্লাহ্, চে দৌলত দারাম এম্‌শব
কে আমাদ নাগাহ্ আঁ দেলদারম্ এম্‌শব।

*   *   *   *

কাশাদ নক্‌শে 'আনাল হক' বর জমী খুন
চুঁ মন্‌সুর, আর কোশী বর দরম এম্‌শব।

—ইয়া আল্লাহ্, কী সম্পদ আজ লাভ করিলাম! হঠাৎ এই নিশীথে প্রিয়তমার আবির্ভাব! আজ যদি আমায় কেহ নিধন করে আমার শোণিতধারাও মন্‌সুর হাল্লাজের ন্যায় জমির উপর 'আনালহক' চিত্র আঁকিতে আঁকিতে প্রবাহিত হইবে। (অর্থাৎ আমি এখন আল্লাহ-ময় হইয়াছি)।[২]

এই দিউয়ানের কবি হাফেজের আসন ভাবজগতের এতই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে কবি নিজকে কখনো কখনো গণ্ডি বা সম্প্রদায়ের সীমার ভিতর ফেলিতে পারেন নাই। প্রেমের রাজ্যে গণ্ডিভেদ বা গোষ্ঠীবিচার থাকিতে পারে না। প্রেমিক কবি নিশিদিন অমৃতের সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত রাখিতেন। তাঁহার অন্যকিছু ভাবিবার সময় ছিল না।

---

১. জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি যেমন চিরন্তন সত্য হইলেও আপনাআপনি কাহারও নিকট প্রস্ফুট হয় না, গুরুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যোগ ও আধ্যাত্ম বিজ্ঞানও তদ্রূপ গুরু ব্যতীত কাহারও আয়ত্ত হয় না। তাই গুরুর এত সংবর্ধনা। মুসলমানেরা গুরুকে পীর বলেন।

২. সাধক মনসুর হাল্লাজ আল্লাহতে আত্মনিবিষ্ট হইয়া "আনালহক" অর্থাৎ আমিই 'আল্লাহ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে মুস্‌লিম জগতে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। পাছে জগতে তাঁহার পূজা প্রবর্তন হয় এই আশঙ্কায় কাজি শ্রেষ্ঠ ইউসুফ তাঁহার এই বাল্যবন্ধুকে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু মনসুরের তখন আত্মসংবরণের সাধ্য ছিল না। এই কাজির নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কথিত আছে তাঁহাকে বধ করিলে তাঁহার শোণিতধারা যেভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতেই আরবি 'আনালহক' বাক্য অঙ্কিত হইয়াছিল।

লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের মুসলমান? কবি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত বাণী—

না মান্ হান্‌ফী, না মান্ শাফী
না মান্ মজহার হাম্বলী দারাম।
মালেকী হাম না মান্ মাগার
মজহাবে এশ্ কী দারাম।

অনুবাদ—

নহিকো হানাফি, শাফি, মালেকি, হাম্বলি,
প্রেম মম একধর্ম অন্য নাহি জানি।[১]

হাফেজ সম্প্রদায় মানিতেন না, কোনো সাম্প্রদায়িক কানুনেরও ধার ধারিতেন না। যে যুগে শ্মশ্রুমুণ্ডনের পাতকে মানুষকে কতকাল জাহান্নামে বাস করিতে হইবে ইহারই নির্ধারণ লইয়া সমাজশাসক মৌলবীগণ দিনের পর দিন তর্কযুদ্ধ চালাইতেন এবং তর্কযুদ্ধকে ক্রমে বাহুযুদ্ধে পরিণত করিতেন, সেই যুগে হাফেজের এই দুঃসাহসিক আচরণ তাঁহার অসাধারণ মনোবলেরই দ্যোতক। বাহ্যিক ধর্মাচারের যে-সকল বিধিনিষেধ সমাজে প্রচলিত আছে সেগুলিকে তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। এমনকি তিনি নিজকে একজন রিন্দা[২] বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

চরিত কথা

হাফেজ নিজকে রিন্দা বলিলেও তাঁহার জীবন উচ্ছৃঙ্খল ছিল এ-কথা কেহ বলেন না। আজীবন কঠোর সাধনা তাঁহার চরিত্রকে সংযত রাখিয়াছিল। যৌবনে তিনি কাব্যসুন্দরীর বরমাল্য অর্জনের জন্য যে-দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সিরাজের চারি মাইল দূরে একটি সমাধিক্ষেত্র ছিল, উহার নাম 'পিরে-সবজ্'। প্রবাদ ছিল—যে ব্যক্তি এই স্থানে একাদিক্রমে চল্লিশ রজনী বিনিদ্র অতিবাহিত করিতে পারিবে তাহার সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে। গ্রাম হইতে দূরে নির্জন প্রদেশে এই সমাধিস্থল, চতুর্দিকে বনজাত বৃক্ষ। স্বভাবত এ-স্থান অতি ভীষণ ছিল। কথিত আছে হাফেজ এই দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিবা অবসানে হাফেজ একাকী এই স্থানে উপনীত হইতেন এবং সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অতিবাহিত করিতেন। সমাধির অনতিদূরে গ্রাম। হাফেজ সমাধির পবিত্র প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে গ্রামের মুক্ত বাতায়ন হইতে আলোকরেখা আসিয়া যেন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিত। একে একে উনচল্লিশ রজনী কাটিয়া গেল। সুবেহ্ সাদেকের প্রথম রশ্মি যখন মর্ত্যের বুকে লুটাইয়া পড়িল তখন হাফেজ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—এক দিব্যমূর্তি জ্যোতি-আভরণে দশদিক আলোকিত করিয়া তাঁহার

---

[১] সুন্নি মুসলমানেরা উপরোক্ত চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

[২] রিন্দা এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকির। তাঁহাদের মতে সাধারণ শাস্ত্রাদেশ এবং নামাজ, রোজা ইত্যাদি অন্তঃসারশূন্য লোকাচার মাত্র। এ সকলে সময় ক্ষেপণ না করিয়া তাহারা যোগাভ্যাসের আনন্দ উপভোগ করা শ্রেয় মনে করেন।

সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভক্ত হাফেজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদ লইয়া গৃহে ফিরিলেন।[১]

সাধারণত লোকে হাফেজকে বিবাহিত পুরুষ বলিয়াই মনে করে। শুনা যায়, তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পত্নীবিয়োগজনিত যন্ত্রণাও তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাই লোকের বিশ্বাস। তাঁহার একটি কবিতায় আছে:

আঁ–ইয়ার, কাজো খানায়ে মা জায়ে পরী-বুদ,
ছর তা কদমাস্ চুঁপরী আজ আয়েব বরী-বুদ।

অনুবাদ—

প্রিয়া সে আমার যার পরশনে
পরীর বাগান কুটির মোর–
আঁধার এ গেহ কোথা আজি সেই
নিখুঁত নির্দোষ পরীয়া মোর!

হাফেজের পারিবারিক-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত আছে তিনি উজির কেয়ামুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত এক কলেজে কোরানের ব্যাখ্যাকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ কলেজ তাঁহারই জন্য স্থাপিত এবং তিনি কিছুদিন তথায় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

হাফেজের মৃত্যুকাল অনির্দিষ্ট। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দৌলতসার মতে ৭৯৪ হিজরি সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজিতে তাহা ১৩৯১ সাল।

সুলতান বাবর যখন বিজয়ীর বেশে সিরাজে প্রবেশ করেন, তখন তদীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোয়াম্মা হাফেজের সমাধির উপর এক মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা পরে অনেকবার সংস্কার লাভ করিয়াছে। ইংরাজ-রাজ তৃতীয় জর্জের প্রেরিত রাজদূত স্যর আউস্‌লি যখন পারস্যে অবস্থান করেন, তখন তিনি এই সমাধি দর্শন করেন। করিম খাঁ নামক এক সদাশয় ব্যক্তি আজর-বায়জান (ইউরোপীয় তুরস্ক) হইতে আনীত একটি বহুমূল্য কৃষ্ণ-প্রস্তরে হাফেজের দুইটি শ্লোক খোদিত করাইয়া ঐ সমাধি ভূষিত করেন এবং চতুর্দিকে প্রস্তরনির্মিত চত্বর প্রস্তুত করাইয়া দেন। তদুপরি সুদৃশ্য গৃহ বিরাজিত এবং উহাতে হাফেজের একখানি সুন্দর কারুকার্য-খচিত গ্রন্থ পাঠকের অধ্যয়নের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। সিরাজের প্রায় দুই মাইল দূরে রোকনাবাদের তীরে এই সমাধি-মন্দির—চারিদিকে উদ্যান-বেষ্টিত। হাফেজের প্রিয় সাইপ্রেস বৃক্ষরাজি এই উদ্যানে শোভা পাইতেছে।

শেরখান লোদী বলেন, হাফেজের মৃত্যু পর কেহ কেহ হাফেজকে বিধর্মী বলিয়া তাঁহার জানাজা পাঠ করিতে অস্বীকার করে। তখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য হাফেজের গ্রন্থ খোলা হইল,[২] তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক বাহির হইল :

কদমে দেরেগ মা'দার্ আয জানাজায়ে হাফেজ,
কে গার্চে গর্কে গোনাহ্ আস্ত্ মীরওয়াদ ব-বেহেশ্।

---

[১] কেহ কেহ বলেন এই মহাপুরুষ সিদ্ধতপ খেজের। এই গল্পের অপর বিবরণ এই—হাফেজের পাঠ্যজীবনের কবিতা জনসমাজে তেমন আদৃত হয় নাই। পরে তিনি 'বাবা কুহী' নামক সিরাজের উত্তরে অবস্থিত এক পার্বত্য দরগায় দরবেশ ইমাম আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তৎপর অপূর্ব কাব্যসম্পদের অধিকারী হন।

[২] হাফেজের কাব্য সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কিংবদন্তি প্রচলিত আছে; যদি কেহ কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া শুদ্ধাচারে ও সংযত মনে হাফেজের কাব্যগ্রন্থ খুলে, তাহা হইলে প্রথম যে-পৃষ্ঠা

ফিরায়ো না ক্ষোভ ভরে, হে বিশ্বাসী, চরণ তোমার
হাফেজের শেষ ক্রিয়া হ'তে।
যদিও পাপের ভারে মগ্ন-প্রায় তরী তাহার
(সে) উত্তরিবে স্বর্গে কোনোমতে।

অতঃপর সযত্নে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। হাফেজের নশ্বরদেহ মাটির ভিতর আত্মগোপন করিল। যাহা অবিনশ্বর তাহা বাঁচিয়া রহিল।

হাফেজের শেষচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া সে সমাধি আজিও দূরাগত পথিকের ভক্তিসঞ্চিত-অশ্রুধারা সংগ্রহ করিতেছে। যদিও উহা ললিতছন্দে, দর্শককে বলে না—

'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ কাল!

* * *

হেথায় নিদ্রিত
কবি শ্রীমধুসূদন'—

তথাপি দর্শকের প্রাণের ভিতর আপনি ধ্বনিয়া উঠে :

বর সরে তোরবতে মা চুঁ গুজারি হিম্মৎ খাহ্
কে জোয়ারৎগাহে রিন্দায়ে জাহাঁ খাহাদ শোদ—হাফেজ

অনুবাদ—

মোর সমাধি শিয়র দিয়া যেতে
আশীর্বাদ চেয়ো পান্থ তুমি;
ধরণীর শাস্ত্রচ্যুত যারা
এ তাঁহাদের হবে তীর্থভূমি।

হাফেজের এ ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। তাঁহার সমাধি সত্যই আজ তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে—শুধু শাস্ত্রচ্যুত রিন্দাদের জন্য নয়, জগতের সকল শ্রেণীর লোকের জন্য।

বাহির হইবে তাহাতেই তাহার যথাযথ উত্তর পাইবে। সুপ্রসিদ্ধ জামী তাঁহার 'সুফিদিগের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে হাফেজকে 'লেছানল গায়েব' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবি বলিয়া গিয়াছেন :

মর-দানে খাক হাম খব্‌রে আসমান দেহান্দ
ফাল কালামে হাফেজ তেরাজ কোন্ লেহাজ।

অর্থাৎ মর্ত্যের লোকেও আকাশের সংবাদ দিয়া থাকে, অতএব হাফেজের ভবিষ্যৎ-বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন কর। উদাহরণ—ঐতিহাসিক মির্জা মেহরি খান বলেন, নাদির সা আফগানদিগকে ইরাক ও ফার্স হইতে বিতাড়িত করিয়া বিশেষ ভক্তিসহকারে সিরাজের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করেন। আজর-বয়জান তখনো তুর্কিদিগের অধীন ছিল। সম্রাট তাহমাস্পের ইচ্ছা, নাদির আজর-বয়জানে গিয়া তুর্কিদিগকে বিতাড়িত করে—পক্ষান্তরে তাঁহার খোরাশানী আমির ওমরাহ্ ও সৈন্যগণের ইচ্ছা তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। উভয়সঙ্কটে পড়িয়া তিনি হাফেজ (গ্রন্থ) খুলিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি তাঁহাদের সম্মুখে বাহির হইল—

এরাক ও ফারেসী গেরেফতি বজেরে খোদ, হাফেজ,
রেয়া, কে, নওবতে বাগদাদ ও ওয়াক্তে তবরেজ আস্ত্।

অর্থাৎ—হে হাফেজ! (কবিতার মাধুর্যে) তুমি এরাক ও ফারেস জয় করিয়াছ; এখন বাগদাদ ও তবরেজ বিজয়ের সময় আসিয়াছে। (অর্থাৎ অধ্যাত্মরাজ্যের দুই স্তর তুমি সাধনায় অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে অবশিষ্ট জয়ের জন্য প্রস্তুত হও)। বলাবাহুল্য নাদির সা হাফেজের কথামতো অগ্রসর হইয়া বাগদাদ ও তবরেজ জয় করেন।

জালালউদ্দীন রুমী

উপরে যে মহাপুরুষের নাম উল্লিখিত হইল তিনি বর্তমানে পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিতসমাজে সুপরিচিত। কবি হিসাবে বল, দার্শনিক হিসাবে বল, আর সিদ্ধতপা সাধক হিসাবেই বল, সকল বিভাগেই ইনি অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছেন। 'মস্‌নবী'র অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ উইলসন সাহেব বলিয়াছেন—"His book should be read not only by the students of theology but by all students as a book of general philosophy." গ্রিক দর্শনের চরম উৎকর্ষ হইতেছে Neoplatonism এবং Mysticism; আর মিস্টিক-ধর্মবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য হইলেন এই মৌলানা রুমী; এই কারণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তাঁহাকে সমভাবে বরণডালায় নন্দিত করিয়াছে। মানুষ যুগযুগান্তব্যাপী চিন্তার ফলে যে বিরাট দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য হইল সত্যের সন্ধান লাভ করা। কিন্তু দর্শন যে-সত্যের সন্ধান দিতেছে, তাহা যদি মানুষের চরম মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রযুজ্য হইতে না পারিল, তবে সে সত্যসন্ধান লাভের সার্থকতা কী?

গ্রিক দার্শনিকগণ নয়শত বৎসর সুগভীর চিন্তার দ্বারা উপনীত হইয়াছিলেন এক নিরবয়ব আত্মবোধহীন (Impersonal) ঐশ-শক্তির ধারণাতে—যাহার কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না, অনুভূতি ছিল না, ছিল শুধু বিশ্বব্যাপী এক অপরিসীম অস্তিত্ব, যাহা বিরাট কর্মশক্তি বা প্রেরণারূপে জগতের ভিতর দিয়া নিজকে ব্যক্ত করিতেছিল। এই-যে একটা অব্যক্ত কর্মশক্তির কল্পনা, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুতেই তাঁহারা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা পৌঁছিতে পারেন নাই। তারপর যখন যিশু আসিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিলেন যে, ঐ কর্মশক্তি একটা অন্ধ কলের শক্তি নহে, উহার ব্যক্তিত্ব আছে, উহা প্রেমময় এবং সচেতন; তখন হইতে একদল দার্শনিক নূতনভাবে ইহার তথ্য নিরূপণের প্রয়াস পাইলেন। ধ্যানযোগে তাঁহারা ইহারা সন্ধান লইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সে-শক্তি জ্যোতিষ্মান্ লীলাময়; কত খেলা করে, সঙ্কেত করে, আবার আপনার আনন্দে আপনি ছুটিয়া বেড়ায়। ইঁহারাই হইলেন মিস্টিক। কিন্তু ইহারা শুধু সে স্রষ্টাশক্তির সৌন্দর্য সন্দর্শনেই আত্মহারা হইলেন। তাহার সহিত ভাবের কোনো আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা পারমার্থিক মোহে বিভোর থাকিতেন কিন্তু এ আত্মবিনিয়োগের কোনো প্রতিদান পাইতেন না। যেখানে প্রেমাস্পদের হৃদয় জানি না, সেখানে কি প্রণয় ঢালিয়া শান্তি পাওয়া যায়? এইখানেই এই অপূর্ব প্রেমচর্চা লইয়াই মিস্টিকদের সহিত সুফিদিগের পার্থক্য। এই স্থানেই সুফিগণ মিস্টিকদিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। সুফিদিগের আরাধ্য শক্তি প্রেমময়, তিনি শুধু আপন মনে খেলা করেন না। কে তাঁহাকে ভালোবাসে সেদিকে তাঁহার যেমন লক্ষ্য, তাঁহার নিকট যাহার যেটুকু প্রাপ্য বা দাবি তাহা বুঝিয়া দিতেও তিনি তেমনি তৎপর। এক কথায় ইনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তবে ব্যক্তির ন্যায় সীমাবদ্ধ নহেন। ইনি সুখ-দুঃখ যেমন অনুভব করিতে পারেন, প্রণয়ীর করুণ আহ্বানে তেমনি তাঁহার হৃদয়ের করুণা উৎসারিত করিয়া তাহার সহিত ভাবের বিনিময় করিতে

জানেন। হজরত মোহাম্মদ (স.) যে নামাজ বা উপাসনা-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে মানুষকে তাহার নিজের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। জগৎ-যন্ত্রের ভিতর মানুষের স্থান কোথায়, স্রষ্টার সহিত তাহার কী সম্বন্ধ ও স্রষ্টার মনস্তুষ্টির জন্য ও নিজেদের কল্যাণের জন্য তাহাকে কী করিতে হইবে, তাহাই শুধু তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রভু এবং ভৃত্যের ভিতর যে-সম্বন্ধ, ভোক্তা ও আহার-দাতার ভিতর যে-সম্বন্ধ, পিতা ও পুত্রের ভিতর যে-সম্বন্ধ, অনুগৃহীত ও অনুগ্রহকারীর ভিতর যে-সম্বন্ধ; তাহা ছাড়া যে আরো একপ্রকার সম্বন্ধ দুইটি প্রাণের ভিতর চলিতে পারে—যে সম্বন্ধের ভিতর কোনোই সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, ভয় নাই, অনুগ্রহ লাভের জন্য দীনতা-বোধ নাই; পক্ষান্তরে শুধু একাত্মবোধ আছে, শুধু বাধাহীন প্রণয়ের বিপুল আনন্দ অনুভূতি আছে, সে-কথা হজরত মোহাম্মদ শুধু 'তাসাউফে'র[1] ভিতর ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই মুসলমানের ফকিরি, ইহাই তাত্ত্বিকের সুফিধর্ম। বাস্তবিক, বিশ্বস্রষ্টার সহিত আমাদের ভাবের আদানপ্রদান স্পষ্টত চলিতে পারে কি না, সে-কথা দর্শন ও বিজ্ঞান-মন্দিরের কীট আমরা, আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু জগতের ইতিহাসে প্রতি যুগেই ইহার অনেক উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। আরবের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তাপস রাবেয়াকে এক ব্যক্তি বিবাহ করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন—এ দেহ, মন সমস্তই একজনকে সঁপিয়া দিয়াছি, তিনিই আমার স্বামী। সেই আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও আমি ভজন করিতে পারিব না। হাফেজ তাঁহাকে প্রণয়াস্পদরূপে লাভ করিয়াছিলেন। ভক্ত রামপ্রসাদ মাতৃরূপে সেই মহাশক্তির অর্চনা করিয়াছিলেন। রুমী একস্থানে বলিয়াছেন—

জালিম তুমি জ্বালিয়াছ রূপের এ কী বহ্নিশিখা
উদ্ধত এ চিত্তগুলি করিতে বিজিত!
দাহন তব প্রেমের রীতি, দাহ্ মোদের ভাগ্য-লিখা
দাও বেদনা যত খুশি পেতেছি এই নগ্ন চিত।
নীরব নিশায় এসেছি আজ একলা তব নিঠুর পথে
কঠোর তব প্রণয়লীলা জানি ওগো জানি;
ধর্ম তোমার কর পালন এসো সখা বিজয়রথে
বেদনাভরা পুলকে আজ সঁপি তোমা হৃদয়খানি।

সুফি জালালউদ্দীনের জীবনে, তাঁহার সকল কাজে, সকল অবস্থায়, এই প্রেমোন্মত্ততার আবেগময় বহিঃপ্রকাশ প্রস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই একটিমাত্র রাগিণী তাঁহার সমগ্র জীবন ধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনো সুর পাঠক তাঁহাতে দেখিতে পাইবেন না।

হিজরি ৬০৪ সালে ৬ই রবিয়ল[2] জালালউদ্দীন পারস্যের অন্তঃপাতী বলখ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় পিতা সুপ্রসিদ্ধ তাপস গ্রন্থকার বাহাউদ্দীন্ ওয়ালিদ বল্খে অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রাজপুরুষগণের সহিত মনান্তর ঘটায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি সপরিবার রুম-দেশের (এশিয়ামাইনর) অন্তর্গত কুনিয়াতে (Iconium) বাসস্থান নির্ণয় করেন। এই দেশের নামানুসারে জালালউদ্দীন 'রুমী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পিতার তপঃপ্রভাব সম্পূর্ণরূপে পুত্রের ভিতর বিদ্যমান ছিল। শুধু পিতা কেন, ইঁহার পূর্বপুরুষেরা সকলেই আধ্যাত্মিক জগতে আচার্যস্থানীয় ছিলেন। জননীর দিক্ দিয়া তাঁহার ধমনির ভিতর মহাত্মা আলী ও হজরত মোহাম্মদের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত ছিল।

---

১. গূঢ় অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

২. ইংরেজি ২৯ সেপ্টেম্বর, ১২০৭ সাল।

পিতৃকুলের দিক দিয়াও তিনি ন্যূন ছিলেন না। বলখের রাজবংশের সহিত তাঁহার পিতৃবংশের রক্তগত সম্পর্ক ছিল। এই বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ তাপস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সেই জালালউদ্দীনের ভিতর অনেক আধিভৌতিক লীলাচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইত। সময়-সময় নানা জ্যোতিষ্মান অলৌকিক মূর্তিকে শূন্যমার্গে বিহার করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেন। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সকলেই, এমনকি তাঁহার পিতা মৌলানা বাহাউদ্দীন পর্যন্ত তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত গম্ভীর ছিল। তিনি সহপাঠী বা সহচরদিগের সহিত ধূলা-খেলা ভালোবাসিতেন না। সর্বদা ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই তিনি রোজা রাখিতে আরম্ভ করেন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহাকে প্রায়ই ভক্তিভরে কোরআনের সুরাগুলি আবৃত্তি করিতে দেখা যাইত। সুমধুর বালকণ্ঠে পবিত্র কোরআন আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার দুনয়নে অশ্রুধারা অনর্গলভাবে বহিয়া চলিত। 'সুরা'-পাঠান্তে ভক্তিতে গদগদ হইয়া আল্লাহ্‌তালাকে প্রণিপাত করিতেন। এই বয়সেই তিনি পিতার সহিত নানা তীর্থক্ষেত্রেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

উপবাসের সঙ্গে তপোবল সঞ্চয়ের কী সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি না; কিন্তু দেখিতে পাই সাধকেরা অধিকাংশই সাধনার জন্য উপবাস-ব্রত প্রতিপালন করিতেন। সাধারণত উপবাসে শারীরিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু সাধকদিগের এই কঠিন ব্রত পালনে কিরূপে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাই আশ্চর্য। জালালউদ্দীন এক-একবারে তিনদিন-চারিদিন, এমনকি কখনো-বা ক্রমাগত সাতদিন পর্যন্ত উপবাস করিতেন। তাঁহার যৌবনের একটি গল্প আছে। তিনি একবার গুরুর আদেশে একাদিক্রমে তিনটি রোজা রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি রোজা চল্লিশদিনব্যাপী ছিল এবং মাঝে যে 'এফতার' করিতেন তাহাও এক পাত্র পানি এবং ২/৩ খানা যবের রুটি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা নহে। তাঁহার ধর্মগুরু মৌলানা বোরহানউদ্দীন তাঁহার এই কঠোর ব্রত উদযাপনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্বসাধনায় পারদর্শী বলিয়া অভিহিত করেন। জালালউদ্দীনের শৈশবেই তদীয় পিতা মৌলানা বাহাউদ্দীন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনি কালে তাপসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবেন। সেইজন্য তিনি আদর করিয়া পুত্রকে সময়-সময় 'মৌলানা' বলিয়া আহ্বান করিতেন।

শৈশবে পিতৃগৃহে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর জালালউদ্দীন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দামেস্কে পাঠ্যাবস্থাতেই জালাল তদীয় দীক্ষাগুরু মহাতপা শামসে তাব্রিজের প্রথম সাক্ষাৎলাভ করেন। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের ভিতর পরিচয় হয় ইহার বহু বৎসর পরে জালালের আবাসস্থান কুনিয়াতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জালালউদ্দীন কতকটা পিতার প্রসিদ্ধির দ্বারা এবং কতকটা স্বীয় প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তদীয় অধ্যাপকগণ এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। যৌবনের লীলাভূমি এই দামেস্কের প্রতি জালালউদ্দীনের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। ইংরেজি ১২৫৯ সালে চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র দুর্দান্ত হালাকু খান যখন বাগদাদ অধিকার করিয়া তদীয় সেনাপতি কুতবগকে দামেস্কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, তখন জালালউদ্দীন কুনিয়ায় ছিলেন। কথিত আছে তিনি ধ্যানযোগে সে ঘটনা জানিতে পারিয়া দামেস্কে উপনীত হন এবং দামেস্কবাসীদিগের সহযোগে সম্মুখযুদ্ধে মোগল-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন।[১]

---

১. তদীয় শিষ্য কুনিয়া-নিবাসী এক মাংস-বিক্রেতা এই ঘটনার প্রবক্তা।

গার্হস্থ্য-জীবন

দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুকাল পরেই জালালউদ্দীনের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি পিতার পরিত্যক্ত ফকিরি আসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং পিতার ও স্বকীয় বহু শিষ্য-সমভিব্যাহারে বিদ্যা ও ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করেন। নানা দিগদেশ হইতে যুবকগণ আসিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিত। তিনি কুনিয়ায় একটি বিদ্যাগারও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বান ঐ প্রদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। জীবনের অতি প্রথম অবস্থা হইতেই তাঁহার শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও নিঃসংশয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

জালালউদ্দীনের এই অগাধ পাণ্ডিত্য অন্তঃসারসম্পন্ন হইয়াছিল মহাতপা ঋষি শামসে তাব্রিজের সংসর্গ দ্বারা। কথিত আছে ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাপস শামসে তাব্রিজ কুনিয়ায় উপনীত হইয়া এক সরাইয়ে আপন অবস্থান নির্ণয় করেন এবং নিজেকে বণিক বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি ভগ্ন জলপাত্র, এক জীর্ণ মাদুর এবং শুষ্ক মৃত্তিকার একটি বালিশ বা ভাঁটা ভিন্ন তাঁহার অপর কোনো সম্বল ছিল না। একদিন মৌলানা রুমী খচ্চর আরোহণে ঐ পথে শিষ্যবর্গসহ যাইতেছিলেন। শাম্‌সে তাব্রিজ তাঁহার গতিরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল, হযরত মোহাম্মদ বড় ছিলেন, না বায়জিদ বোস্তামী? রুমী বলিলেন, নিশ্চয়ই হজরত মোহাম্মদ।

শামসে তাব্রিজ—তবে এ-কথার অর্থ কী? হযরত বলিয়াছেন, হে খোদা, আমরা তোমাকে যথাযথ বুঝিতে পারিলাম না। আর বায়জিদ বলিয়াছেন, কী বিরাট আমার মহিমা! আমি ধন্য!

রুমী এ-কথায় বিস্মিত হইলেন এবং বুঝিলেন এ ব্যক্তি সামান্য নহেন। তখন তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং উভয়ে গভীর আগ্রহের সহিত নির্জন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে রুমী অসাধারণ তাপসে পরিণত হইয়াছিলেন।[১]

জালালউদ্দীন ব্যবহারে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। যে কেহ তাঁহাকে 'সালাম' জানাইত তাহাকেই তিনি প্রত্যুত্তরে 'সালাম' বলিতেন; ইতর বা তুচ্ছ লোক বলিয়া কাহারো অভিবাদনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। বিধর্মীদিগকেও প্রত্যাভিবাদন করিতে ত্রুটি করিতেন না। শিশু এবং বৃদ্ধাগণ তাঁহার সাতিশয় অনুকম্পার পাত্র ছিল। একবার একদল নগ্নদেহ বালক তাঁহাকে অভিবাদন করায় তাঁহাকেও উহাদের নিকট মস্তক নোয়াইতে দেখা গিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদের পবিত্র দন্ত যখন বিধর্মীর প্রস্তরাঘাতে উৎপাটিত হইল, তখন তিনি কিরূপ অবিকৃত-চিত্তে ঐ পাষণ্ডদিগের শাস্তির পরিবর্তে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আল্লা'র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কথা জালালউদ্দীন তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া বলিতে বলিতে তদ্‌গত হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন—নিষ্ফল বৃক্ষই অনবনমিত শিরে দণ্ডায়মান থাকে যে-বৃক্ষ ফল-ফুলে পরিপূরিত, তাহার মস্তক সদা নিম্নদিকেই আনত

---

[১] অপর বিবরণ এই—শাম্‌সে তাব্রিজ প্রথম সাক্ষাতেই মৌলানা রুমীকে প্রশ্ন করেন—মৌলানা, তুমি কী শিক্ষা দিতেছ? মৌলানা রুমী উত্তর করিলেন, মানুষকে কোরান হাদিস ও শরিয়তের পথে চলিতে শিক্ষা দেই। শাম্‌সে তাব্রিজ—ওহ্‌ কেবল্‌ উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; এখনো ভিতরে ডুবিতে পার নাই! মৌলানা—ভিতরের সে শিক্ষা কী প্রকার? শাম্‌সে তাব্রিজ—যে-শিক্ষায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র ভিতর অভেদ মিলন সম্পাদিত হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। মৌলানা রুমী এই কথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

থাকে। জালালউদ্দীন সাধনার সৌকর্যার্থে সঙ্গীতাদির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এজন্য প্রথম-প্রথম কত লোক যে তাঁহার বিরুদ্ধে-সমালোচনা ও দুর্নাম করিত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি কাহারো জবাব দিতেন না। পরে সেগুলি আপনি থামিয়া গিয়াছিল।

একদা দুইজন তুর্কি ছাত্র বহু কষ্টে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফল সংগ্রহ করিয়া জালালউদ্দীনকে উপহার দিয়াছিল এবং অত্যন্ত নম্রতা সহকারে নিজেদের অক্ষমতা ও উপহারের তুচ্ছতা সম্বন্ধে জালালউদ্দীনের নিকট নিবেদন করিতেছিল। জালালউদ্দীন তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিম্নলিখিত গল্পটির অবতারণা করিলেন—

একদিন হজরত মোহাম্মদ দৈববাণী শুনিলেন—বিশ্বাসীগণের উচিত তাহারা যেন নিজ নিজ সম্পত্তি হইতে যে যতটুকু পারে আল্লা'র কার্যে নিয়োজিত করে। এই কথা শুনিয়া কেহ তাহার সম্পত্তির তৃতীয়াংশ, কেহ অর্ধেক, আর আবুবকর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হজরতের নিকট অর্পণ করিল। এক দরিদ্র বৃদ্ধা আনিল তিনটি খেজুর আর একখানি ময়দার রুটি, ইহা ভিন্ন তাহার আর কোনো সম্পত্তি পৃথিবীতে ছিল না। শিষ্যগণ একটু মৃদু হাসিয়া এ উহার পানে চাহিল। প্রভু মোহাম্মদ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—বন্ধুগণ, আমি দিব্য দেখিতে পাইতেছি যে, আল্লাহ্‌তালা বিশ্বাসীগণের ভক্তির দান তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন। একদিকে সমস্ত বিশ্বাসীর সম্পত্তি, আর একদিকে ঐ বৃদ্ধার তিনটি খেজুর ও একখণ্ড রুটি। কিন্তু দেখ, বৃদ্ধার দান ওজনে ভারী হইল। কেন, বলিতে পার কি? কারণ, বৃদ্ধার মতো ত্যাগ স্বীকার আর কেহই করিতে পারে নাই। প্রভু আরো বলিলেন—কাঙাল যখন ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে, মনে করিও না তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে তোমার অপব্যয় হইবে! কেননা, তুমি যেই ভিক্ষাদানের সঙ্কল্প কর তখনই আল্লাহ্ তোমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন; তাই তোমার দান প্রথমে আল্লার হস্তে পড়ে, তারপর ভিখারির নিকট পৌঁছে।

কুনিয়ার শাসনকর্তা মঈনউদ্দীন একদিন এক বৃহৎ ভোজসভার অনুষ্ঠান করিয়া জালালউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ করেন। জালালউদ্দীন সাধনায় নিমজ্জিত থাকায় তাঁহার সভায় যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে আভিজাত্যগর্বে গর্বিত আমির-ওমরাহের দল এমনভাবে বসিয়া গিয়াছিল যে, সম্মুখে একখানি আসনও আর খালি ছিল না। জালালউদ্দীন যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তিনি কিছুই না বলিয়া সোজা গিয়া সভাস্থলের মধ্যস্থানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। যে-সকল শিষ্য ও বান্ধব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারও গিয়া জালালের সহিত একত্রে বসিলেন। এক ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—শ্রেষ্ঠ আসন কোথায় থাকে? জালালের শিষ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন—সভাগৃহের মধ্যস্থলে। আর একজন উত্তর করিলেন—মজলিশের সকলে যেখানে পাদুকা রাখে, সেইখানের ধূলাই বসিবার শ্রেষ্ঠ আসন। তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন—পর্বত-গুহা। সকলে জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ জালালের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। জালাল কহিলেন—যেখানে বসিলে প্রিয়তমের সঙ্গলাভ হয়, সেইটিই শ্রেষ্ঠ আসন। সকলে চাহিয়া দেখিল, জালালের সম্মুখে তদীয় প্রিয়তম গুরু মহাতপা শাম্‌সে তাব্রিজ সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান হইয়া বসিয়া আছেন।

ধর্মোৎসব হইলেই সেখানে জালালউদ্দীনের নিমন্ত্রণ হইত। জালাল শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মজলিশে গিয়া গজলাদি কীর্তন করিতেন।

ব্যথিত তৃষিত পাপতাপদগ্ধ নানা শ্রেণীর লোকই সান্ত্বনার জন্য জালালের নিকট গমন করিত। কুনিয়ার শাসনকর্তা পরওয়ানা একবার জালালের শিষ্যমণ্ডলীর নৈতিক

অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে জালালউদ্দীন বলিয়াছিলেন—ইহারা পতিত বলিয়াই তো আমার নিকট আসিয়াছে; যাহারা সৎপথে আছে তাহাদিগের তো চালকের প্রয়োজন নাই।

এক দিবস এক পুত্রহারা পিতা আসিয়া শোকাতুর হৃদয়ে জালালের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। জালালও কাঁদিলেন। কিন্তু জালাল কাঁদিলেন বৃদ্ধের পুত্রের জন্য নহে। তিনি বলিলেন—হায়, একটি পুত্রের জন্য লোকে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে! আর পার্থিব মোহে পড়িয়া মানুষ যে তাহার জীবনের সর্বস্ব, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (খোদাকে) হারাইতে বসিয়াছে সে-কথা যদি তাহারা একবার বুঝিত, তবে না-জানি জগতে কী প্রলয়কাণ্ডই সংঘটিত হইত।

জালালউদ্দীনের মতে প্রকৃত কাবা মক্কার সেই চতুষ্কোণ প্রস্তরগৃহ নহে। মানুষের অন্তরই প্রকৃত কাবা বা আল্লার গৃহ। তিনি বলিতেন শুধু কার্য দ্বারাই যে পাপানুষ্ঠান হয় এমন নহে, চিন্তার দ্বারাও অনেক পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জালালউদ্দীন ভণ্ডামি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিবস এক খ্রিস্টিয়ান সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঘনবিন্যস্ত শ্বেত শ্মশ্রুতে সন্ন্যাসীর বক্ষদেশ প্লাবিত, কিন্তু মুখে লালসা ও বিলাসিতার পূর্ণচিহ্ন বিদ্যমান। জালাল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—ওগো তোমারই বয়স বেশি, না তোমার ঐ শ্মশ্রুর বয়স বেশি? সন্ন্যাসী রাগিয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই আমার বয়স বেশি। জালাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন—যে পাছে আসিয়াছে সে বিদায়ের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, আর তোমার কি বিদায়ের কথা স্মরণ হয় না?

স্পষ্ট কথা বলিতে জালালউদ্দীন কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। একদিন শাসনকর্তা পরওয়ানার মনে হইল, এত লোককে জালালউদ্দীন 'হেদায়েত' করেন আর তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কখনো কিছুই বলেন না—একী অদ্ভুত! জালালের নিকট পরওয়ানার অভিলাষ জ্ঞাপন করা হইল। জালাল উত্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—আপনি কি পবিত্র কোরআন এবং জামি-উল-ওসুল নামক আইন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? পরওয়ানা লিখিলেন—হাঁ। তখন জালাল কহিলেন—কোরআন এবং জামি-উল-ওসুল-এর মতো নীতিশাস্ত্র যাঁহাকে সংশোধিত করিতে পারে নাই, তাঁহাকে সংশোধন করা জালালের কার্য নয়।

দেহত্যাগ

ইংরেজি ১২৭৩ সনের ১৬ ডিসেম্বর জালালউদ্দীন দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বেই জালালউদ্দীন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনসূর্য অস্তমিত হইতে আর বিলম্ব নাই। তাই বন্ধুবর্গ ও শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে কেহ বিচলিত না হয় তদুদ্দেশে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। এই নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ইহার ভিতরে যে সনাতন মানুষটি রহিয়াছে সে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে। মহর্ষি মনসুর তদীয় মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে তাপসশ্রেষ্ঠ আত্তারের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে আমিও সময়-সময় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। মহাপুরুষ মোহাম্মদের শেষ বাণী তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে।

তিনি মৃত্যুকালে শিষ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন—জীবিত অবস্থায় আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, আবার মৃত্যুর পরও তোমাদিগকে এমন আশিসবাণী বর্ষণ করিতে থাকিব। আজ তাঁহারই পবিত্র ভাষায় আমি তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি।

মহর্ষি এই বলিয়া নীরব হইলেন এবং কাফনের বস্ত্রের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহর্ষির পুণ্যশীলা পত্নী খেরা খাতুন স্বামীশোকে একান্ত অধীরা হইয়া অঙ্গের বস্ত্রাভরণ ছিন্নভিন্ন করিতে ও করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। জালালউদ্দীন সকলকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এই শেষ উপদেশ কয়টি প্রদান করিলেন : (১) অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা সকল কার্যে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবে; (২) আহার, নিদ্রা ও বাক্যালাপে যতদূর সাধ্য সংযমী হইবে; (৩) বিদ্রোহভাব ও পাপকে সর্বদা বর্জন করিবে; (৪) কদাপি নামাজ ও রোজাকে কা'জা করিবে না; (৫) ইন্দ্রিয়লালসাকে কখনো প্রশ্রয় দিবে না; (৬) সকল মানুষের অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাইবে; (৭) তরলমতি ও বিষয়ীদিগের সংসর্গ ছাড়িয়া সাধু ও গুণীদিগের সহবাস চেষ্টা করিবে। মানুষের ভিতর তিনিই শ্রেষ্ঠ যাঁহার দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয়, আর বাক্যের ভিতর তাহাই শ্রেয় যাহা সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচিত।

অতঃপর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় করিলেন। সুলতান ওয়ালেদ পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। জালাল তাঁহাকেও আশ্বস্ত করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে অন্য কক্ষে পাঠাইলেন। তারপর তাঁহার জীবনের শেষ গজলটি এই মর্মে গাহিলেন—

সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এখন চৌদিকে কেবল শান্তি আর নীরবতা। হে আমার প্রাণপ্রিয় নিষ্ঠুর, তুমি এসো, এই নিশীথে—নীরবতায় আমার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার কর। চতুর্দিকে সকলে আমার ব্যথায় বিক্ষুব্ধ হউক। আর আমি আনন্দে তোমার রূপসুধা পান করি। সে মাধুরী এই এমনই চমৎকার যে তুমি যতই কেন নিষ্ঠুর হও না, আমার নিকট তুমি সবচাইতে প্রিয়, প্রাণের অন্তরতম সখা!

আমরা তো জ্বলিবার জন্যই আসিয়াছি। আর তুমি চিরকাল জয়যুক্ত হইয়াই চলিয়াছ। তোমার বিজয়রথের নিষ্পেষণে যদি অন্যের প্রাণহানি হয়, সে হত্যায় তোমার অপরাধ হইবে না।

মৃত্যু কঠোর সন্দেহ নাই, কিন্তু মৃত্যুই জীবের অপরিহার্য পরিণাম। জন্মগ্রহণরূপ পাপ যখন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাহার শেষ ফল আসিবেই আসিবে। গত নিশায় আমি তোমার মরণদূতের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি।

গজল থামিয়া গেলে অপূর্ব জ্যোতিভূষণে সংবৃত হইয়া জালালউদ্দীন নীরব হইলেন। নীরবেই প্রেমাস্পদের দেশে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে অশ্রু-উছল আঁখিপাতা নিমীলিত হইয়া আসিল।

জালালউদ্দীন যে-স্থানে চলিয়া গেলেন সেই দেশের জন্যই যেন তাঁর প্রাণ সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। উহা যেন এ পৃথিবীর কোনোকিছুর সহিতই মিশিত না। এই মর্ত্য যেন কোনোদিনই তাঁহার নিজের দেশ ছিল না। তাঁহার মহাগ্রন্থ 'মসনবী'র প্রথমেই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বোশ্‌নো আজনায় চুন্‌ হেকায়েত মীকুনাম্‌
ও আজ্‌ জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাম্‌।
কায্‌ নায়েস্তান্‌ তা, ম'রা বোরনীয়া আন্দ
আয্‌ নফিরাম্‌ মর্দ্দ জান্‌ নালীদা আন্দ্‌।
সীনা খাহম্‌ শরহে শরহে আয ফেরাক্‌

তা বোগোইয়াম্ শরহে দর্দ্দে এশ্‌তেয়াক।
হর্ কাছে কু দূর মানাদ্ আয্ আস্‌লে খিশ্
বায জোইয়াদ্ রোজগারে ওস্‌লে খিশ্।"

অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ছিল নলবনের একটি নল (বংশী); সে স্বস্থানে চ্যুত হইয়া এই মর্ত্যধামে নিশিদিন কাঁদিয়া ফিরিতেছে ও আপনার বিরহের শোকোচ্ছ্বাস গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই সমবেদনায় আজ জগতের যত নরনারী ব্যথিত। দিল্ তাহার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে! সে চায় তাহার এই মর্মব্যথা জগতের দ্বারে দ্বারে শুনাইতে। কিন্তু ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহার এ মর্মবেদনা কে বুঝিবে? স্বগোত্র হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সে স্বতঃই চায় তাহার পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে—আমি আমার সে স্বস্থানে স্বজনের নিকট কবে ফিরিয়া যাইব!

শব যখন সমাধিক্ষেত্রে নীত হইল তখন কুনিয়ার সকল শ্রেণীর লোকই তাহার অনুগমন করিল। তুর্কি, রোমান, ইহুদি, খ্রিস্টান কেহই তাহাতে যোগদান না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। শোক ও শ্রদ্ধার অশ্রুবারি অগণিত অক্ষি বহিয়া মহর্ষি জালালউদ্দীনের পবিত্র সমাধিস্থল নিষিক্ত করিল।

রচনা

জালালউদ্দীনের রচনার প্রধান বিশেষত্ব ছিল Optimism। উহার কোথাও নৈরাশ্য বা নিরুৎসাহের ভাব একটুও দৃষ্ট হয় না। সর্বত্রই একটা বিপুল আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে। দারুণ বিরহের খেদোক্তিগুলিও তাঁহার ভাষায় যেন আশার আলোকে রক্তিম হইয়া ফুটিত।

সিরাজের অধিপতি 'শাম্‌স্‌উদ্দিন হিন্দ' একদা বিশ্বত্রাস সম্রাট চেঙ্গিস খানকে উপহার দিবার জন্য একছত্র কবিতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। তদীয় বন্ধু শেখ সাদিকে তিনি এজন্য অনুরোধ করেন। সাদি নিজ রচনার পরিবর্তে এই তরুণ কবির একটি কবিতা পাঠাইয়া দেন। তাহার ভাবার্থ এই—

ঐ বাজে গো ঐ বাজে—
আকাশ বেয়ে বাতাস ছেয়ে, কী যেন ঐ আহ্বান-গীতি—
কাজ হতে মন ছিনিয়ে নেয়, দুনিয়াদারি গুলিয়ে দেয়;
সে নিছনি আমায় ঘিরি ঐ বাজে গো ঐ বাজে!
ও বুঝেছি, নওরোজা আজ, ভেশ্‌তবাগে খোশ্‌রোজা,
ভেদ-বিচার সব মুলতুবি আজ, গোস্তাখিতে চাই সাজা;
আম জেয়াফৎ, খাস কারো নয়, সবার তরে পথ সোজা!
ছুটবে আজি জাহান জোড়া মুক্তিমিছিল দিল্‌তাজা।

শূন্য হবে বিশ্বকারা আজ দুয়ারে নেই পাহারা;
কী যে হবে খুশির বাহার, তাই ভেবে গো মরি!
মুক্তি-ডাকে ছুটবে সবাই, আজাদ মানুষ পাগলপারা
দেখার তরে কেউ না রবে ভাগ্যহীন হেথায় পড়ি।

কবি বিধাতার করুণার দিকটা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছেন; আলোকদৃষ্ট নন্দনে আজ বিশ্ববাসীর নিমন্ত্রণ; পাপী আর পুণ্যবান বলিয়া কোনো শব্দ নাই, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। কবি দেখিতেছেন সবাই বিধাতার সেই করুণা-অমৃত পানের

জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহাদের এই শোভাযাত্রা নয়ন ভরিয়া দেখিবে এমন একটি লোক যে আর বিশ্বে বাকি থাকিবে না এই যা কবির দুঃখ।

সাদি উক্ত বয়েৎটি পাঠাইবার সময় সামসউদ্দীন হিন্দকে লিখিয়াছিলেন—আমি আজ আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমাদের ভিতর এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কবিকুলে সম্রাটস্বরূপ। তাঁহার শুভ আগমনে আমরা ধন্য হইয়াছি। তাই আজ আমাদের সবার অগ্রে তাঁহারই অমূল্য বয়েৎটি আপনার নিকট উপহারার্থ প্রেরণ করিলাম।[১]

জালালউদ্দীন কবিতাকে সামান্য বাক্যবিন্যাস মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, কবির প্রাণ বংশীস্বরূপ। যে বেণুবনে এই বাঁশীর উদ্ভব সেইখানেরই শেখা গান এখানে সে নানা সুরে ব্যক্ত করে। যাঁহারা কবির শুধু সুরের রস ভোগ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। কবির বাঁশরী যে গান গায় সেই গানের সত্যকে বুঝিতে হইবে তবেই তোমরা সত্যজীবনের ও পরমার্থের গোপন সন্ধান লাভ করিবে।

মস্‌নবী

জালালউদ্দীন রুমীর সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থের নাম মসনবী। মসনবীর কবিতা অতি সুললিত। মৌলবীগণ সভাগৃহে সুমধুর ঝঙ্কারে মসনবীর কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবের গভীরতা ও উপদেশের সারবত্তা হিসেবে পারস্যবাসীগণ মসনবীকে কোরানের নিম্নেই স্থান দিয়া থাকেন। যে মহাকবি জামী প্রথমে স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে আপনাকে মৌলানা জালালউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া মসনবীকে উপেক্ষা করিতেন এবং স্বীয় পুত্রকে শিক্ষাদানকালে বলিয়াছিলেন—

মস্‌নবীরা মা নবী ইয়া মা শনবী

—মস্‌নবীকে পড়িবেও না শুনিবেও না—তিনিই আবার ঘটনাচক্রে একদিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহার কিয়দংশ পাঠ করেন এবং আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে বলেন—

---

[১] জালালউদ্দীন রুমীর যৌবনের রচনা চেঙ্গিস খাঁর সংবর্ধনায় প্রেরিত হইয়াছিল। আর এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে চেঙ্গিস বংশীয় সেনাপতি কাগাতু খান যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুনিয়ায় উপনীত হন, কথিত আছে, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। কাগাতু খানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে কুনিয়ার এ শক্তি ছিল না। নগরবাসীদের জীবনমরণ বিজয়ী মোগলের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছিল। কাগাতু খান প্রত্যুষে বিজয়ীবেশে নগরে প্রবেশ করিবেন এবং কুনিয়ার যাহা-কিছু মূল্যবান তৎসমুদয় লুণ্ঠন করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে; নগরবাসীরা কাগাতুর নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া ও জীবন ভিক্ষা চাহিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে। কাগাতু সেই সমুদয় বিবেচনা করিতেছেন। সেই রজনীতে কাগাতু স্বপ্নে দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ রুদ্রতেজে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। বজ্রের ধ্বনিতে মহাপুরুষ গর্জিয়া কহিলেন—কুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর আমি; তুমি এখানে কী চাও বর্বর? আরো কী তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শ্রোতা তখন ভীতি-বিহ্বলমূর্ছিত-চিত্ত ও আড়ষ্ট। কতক্ষণ পরে চেতনা হইলে কাগাতু দেখিলেন গৃহে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, শুধু একটা সুমধুর সুরভি গৃহের আলোকরাশির সহিত মিশিয়া মিশিয়া ফিরিতেছিল! কাগাতুর কুনিয়া লুণ্ঠনপর্বের এইখানেই যবনিকা-পতন হইল। পরদিবসেই তিনি মহাত্মা জালালের সমাধিতে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ও কুনিয়াবাসীদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া পশ্চিম এশিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

মস্‌নবীয়ে হাস্ত কোরান   দর-যবানে পাহ্‌লুবী
মসনবী মৌলুবীয়ে মা'নবী

—মসনবী পারস্য ভাষায় কোরান স্বরূপ ।

মসনবীর ইংরাজি অনুবাদক উইলসনের অভিমত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । মসনবীর বিশেষত্ব এই—ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই । কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খ্রিস্টিয়ান—তত্ত্বপিপাসু মাত্রেই ইহাতে গভীর ভগবৎ-প্রেমের অনাবিল ও অফুরন্ত রসধারা উপভোগ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিতে পারেন । আচার, শাস্ত্রাদেশ বা ধর্মের বাহ্য আবরণ লইয়া ইহাতে কোনো বাগাড়ম্বর নাই । মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভিতরকার শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই এই কাব্যের বর্ণনীয় । জালালউদ্দীন সমস্ত বিশ্বমানবকে একই খোদার সৃষ্ট বলিয়া আপনার জানিতেন । তাঁহার কবিতায়ও সেই বিশ্বজনীন উদারতার প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় ।[১] প্রেমের রাজ্যে যে-কোনো জাতি বর্ণ বা দেশভেদ থাকিতে পারে না জালালউদ্দীন মস্‌নবীতে তাহা অতি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন ।

মসনবীর লিপিভঙ্গিতেও বিশেষত্ব আছে । অল্পশিক্ষিত লোকেরাও ইহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে । আবার পণ্ডিতেরা ইহার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আস্বাদ লাভ করিয়া বিস্ময়ে মূঢ় হইয়া পড়েন । পৃথিবীর বহু বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই ইহা গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষিত হইয়া থাকে ।[২]

মসনবী প্রেমোন্মত্ত সুফি-হৃদয়ের উৎসারিত আবেগরাশির নির্মিত এক বিরাট সৌধ-বিশেষ । উহার ছত্রে ছত্রে পরমাত্মার সহিত মিলনেচ্ছু মানবাত্মার আকুল উন্মাদনা বিচ্ছুরিত । জগতের সাহিত্যে এ জিনিস নূতন না হইলেও বলিবার ভঙ্গিতে ও প্রকাশের নিবিড়তায় মসনবীতে ইহা এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে । রুমীর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই পারস্যের গগনে পবনে এই মরমী সুরটি ধ্বনিত হইতেছিল । তাপস-কবি আত্তার তাঁহার সুমধুর লঘুপুত ছন্দে এই মর্মের অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন । অন্যদিকে মরমী সাধক সানাই তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় এই সুরটিকে খুব গভীর ও জাঁকালো করিয়া তুলিয়াছিলেন । রুমীতে এই উভয় সৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছে । রুমীর শিষ্যগণ আত্তারের ললিত-ছন্দে সানাই-এর গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে চাহিয়াছিল, তারই ফলে এই মস্‌নবী রচিত হয় । রুমী বলিতেছেন—

আত্তার রুহ্ বুদ ও সানাই দো চশ্‌মে উ
মা আজ পায়ে সানাই ও আত্তার আমাদেম ।

—আত্তার মরমী শিক্ষার প্রাণ ও সানাই উহার দুটি চক্ষু । আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি ।

---

১. রুমীরই বিশ্বপ্রেমসূচক একটি পারস্য কবিতার নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজি অনুবাদ ইংরাজি পাঠক মাত্রেরই সুপরিচিত—

Abu bin Adham (may his tribe increase)
Awoke one night from a deep dream of peace

*   *   *   *

etc.

২. তুর্কিদের নিকট এই গ্রন্থ অতি প্রিয় । তাঁহারা এই গ্রন্থের যত টীকা ও অনুশীলন প্রকাশ করিয়াছেন এত অন্য কোনও জাতি করে নাই ।

সুফিমত

সুফিদিগের মতে মানবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একই । সৃষ্টির প্রবাহে মানবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে । জড়দেহের সংশ্রবে আসিয়া সে আপনার পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছে । সংসার, স্বজন, স্বার্থ, আধিব্যাধির আক্রমণ এইসব দ্বারা সে আপনার চারিদিকে এমনি একটা বেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছে যে সে আর মুহূর্তের জন্যও নিজকে এই বৃত্ত হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না । কিন্তু তাহার স্বভাবগত আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার মূল উৎস সেই পরমাত্মার সহিত । নবাগত বালিকাবধূ যেমন স্বামীগৃহের সকল আনন্দ-কোলাহলের ভিতরও আপন পিতৃগৃহের শৈশবস্মৃতিটি স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করে, মানবাত্মাও তেমনি সংসারের বিপুল কলরোলের ভিতর আপনার অজ্ঞাতে, স্বীয় জন্মস্থানের অজানা বিরহে আকুলিব্যাকুলি করিয়া ফিরে; কিন্তু মানব তাহা বুঝিতে পারে না । রুমী মস্‌নবীর প্রথমেই বলিতেছেন—

বোশ্‌নো আয নায় চুন্‌ হেকায়েত   মীকুনাদ
ও আয জুদায়ী   হা শেকায়েত   মীকুনাদ
কায নায়েস্তান   তা মরা বুব্‌   –রীদা আন্দ
আয নফিরাম   মরদ্‌ ও যান্‌ না   –লীদা আন্দ[১]
–ইত্যাদি

সুফির মতে এই দেহই মানবাত্মা ও পরামাত্মার মিলনের মহা অন্তরায় । দেহের ধ্বংসেই আত্মার মুক্তি । তাই সুফিরা দেহ-কারা হইতে মুক্তির জন্য সর্বদাই লালায়িত । সুফির জীবনব্যাপী সাধনা এই মুক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে । কঠোর তপস্যা দ্বারা এই দেহরূপ কারাগারকে সুফি নিজের আয়ত্ত করেন । তারপর তাঁহার বন্দি আত্মা শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া নিজকে সম্রাটরূপে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে । কারাগার তখন রমণীয় উদ্যান-বাটিকায় পরিণত হয় । কারাপ্রহরীরা অর্থাৎ রিপুগণ তখন আর শত্রুতা না করিয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য করিতে থাকে ; জীবনপথের সকল কাঁটা তখন গোলাব হইয়া ফুটিয়া উঠে ।

দেহের ভিতর যে কামনা মানুষকে সর্বদা সত্যপথ হইতে এদিক-ওদিক টানিয়া লইতেছে, যাহা এক মানুষের স্বার্থকে অপরের স্বার্থ হইতে পৃথক করিয়া দাঁড় করাইতেছে, এক কথায় যাহা মানুষকে ব্যক্তিত্ব বা অহং জ্ঞান প্রদান করিয়াছে সেই জৈব আকাঙ্ক্ষার নাম সুফির ভাষায় নফ্‌স্‌ । নফ্‌সের ধ্বংসেই দেহের কর্তৃত্বের অবসান ও আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণতা । তাই নফ্‌সের সহিত সুফির জীবনব্যাপী সংগ্রাম । এ সংগ্রামের অবসান সেইদিন যেদিন নফ্‌স্‌ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়া আত্মার আজ্ঞাবহ হইবে; আত্মার মোক্ষপথের অন্তরায় না হইয়া উহার বহনরূপে প্রযুক্ত হইবে । রুমী বলিতেছেন—

শাহ্‌ জান্‌ মর   জেহ্‌ম্‌রা বী   –রাঁ কুনাদ
বা'দ বীরা   –নিয়াশ আবা   –দাঁ কুনাদ
আয় খোন্‌কে জানী   কে বহ্‌রে   এক্‌শে 'হাল'
বজ্‌ল্‌ কার্‌দ্‌ ও   খাম মান ও   মোল্‌ক মাল
–মস্‌নবী ।

আত্মারূপ সম্রাট প্রথমে দেহরাজ্যকে বীরান অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করেন, তারপর সেখানে এক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ।[২] ধন্য সেই মহাজন যিনি 'হাল' অর্থাৎ

---

১. অর্থ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে ।

২. Compare Prefectionism in Ethics–Vide Seth and other authers.

পরমাত্মার সহিত মিলনসুখের অভিলাষে গৃহধন ও রাজ্যসুখ বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন।

সুফির সাধনার স্তর প্রধানত তিনটি—তরিকৎ, হকিকৎ ও মা'রেফৎ[1]। তরিকতের প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় যে জেক্‌র (জপ) ও শ্বাসবায়ুর নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় তাহারও উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন ও নফ্‌সকে দুর্বল করা। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার ধারাও ক্রমে কঠোরতর করা হয়। এইরূপে সুফির অন্তর হইতে যখন বিষয়বাসনা তিরোহিত হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয় তখন সময়-সময় সুফি ধ্যানাবস্থায় আল্লাহর অপূর্ব দ্যুতি দেখতে পান। এই অবস্থার নামই হকিকৎ। হকিকতের আরো উর্ধ্বে মা'রেফতের স্তর। সুফি যখন এই স্তরে উন্নীত হন তখন আপনার ভিতর আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করেন। সুফির এই মুক্তিসংগ্রামের সারথি হইতেছেন তাঁহার পীর। পীর বা মোর্শেদই শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে সাধনার একস্তর হইতে অন্যস্তরে উন্নীত করেন। সাধনারূপ সমরক্ষেত্রে পীরের সারথ্য ব্যতীত কেহই অগ্রসর হইতে পারে না; তাই পীরের পতি সুফির শ্রদ্ধা অপরিসীম, নির্ভর অকাট্য। মৌলানা রুমী তদীয় গুরু শাম্‌সে-তাব্রিজের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। হাফেজ তাঁহার দিউয়ানের প্রথমে লিখিয়াছেন—

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোনো
গায়াৎ পীরে মোগাঁ গোইয়াদ
কে ছালেক বেখবর না বুয়াদ
যে রাহ্‌ ও রেছমে মোঞ্জেল হা।

—পীরের আদেশ হইলে জায়নামাজ মদিরাসিক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিও না। কেননা, মুক্তিপথের কোন্‌ স্তরে কী রীতি তাহা তিনিই অবগত আছেন।

সুফি যখন সাধনায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন বা তাঁহার প্রাণের ভিতর ভগবৎ-প্রেম মন্দীভূত হইয়া আসে তখন তিনি পীরের শরণাপন্ন হন। পীরই তখন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে আপন হৃদয়ের প্রেমবন্যা শিষ্যের প্রাণে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত করাইয়া দেন। নিদাঘদগ্ধ তৃণ যেমন বর্ষার বারিধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, ভক্তের হৃদয়ও তেমনি গুরুর সাহচর্যে নবপ্রেমে ভরপুর হইয়া উঠে।

ক্রমে সুফি যখন উর্ধ্বতন স্তরে (মা'রেফৎ) উন্নীত হইয়া আপনার ভিতর আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করেন তখন তাঁহার অহং সীমা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের গণ্ডি কোথায় ভাসিয়া যায়। তিনি তখন অসীমের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। আপনার ভিতর অসীমতা অনুভব করিতে থাকেন। সৎ-চিৎ আনন্দে তিনি বিভোর হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজৈশ্বর্যকে অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ করেন। মুহূর্তের জন্য যদি সেই মিলন-অনুভূতি তিরোহিত হয়, সুফি একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। আবার যখন হৃদয়ে সেই অলৌকিক দ্যুতির আবির্ভাব হয় তখন সুফি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সুফির এই অবস্থাকে 'হাল' বলে।

মা'রেফতের স্তরে উন্নীত হইলে আত্মা ও পরমাত্মায় আর কোনো ভেদ জ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ এতদুভয়ের মিলনাবস্থা, ততক্ষণই আত্মার আনন্দোৎসব। বিচ্ছেদ আসিলেই জীবাত্মা জলভ্রষ্ট মীনের ন্যায় মুষরিয়া পড়ে। রুমী বলিতেছেন—

জুম্‌লা মাশুক   আস্ত ও আশেক   পর্দায়ে
যেন্দা মাশুক   আস্ত ও আশেক   মোর্দ্দায়ে।
চুন্‌ না বাশাদ   এশ্‌করা পর্‌   —ওয়ায়ে উ
উ চু মর্‌গে   মানাদ বেপর্‌   —ওয়ায়ে উ!
—মস্‌নবী।

---

[1] যাহারা সুফিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন না সে-সকল মুসলমান কেবল শরিয়ৎ অনুসরণ করিয়া চলেন। শরিয়ৎ =শরাহ, সাধারণ বিধি। তরিকৎ=পন্থা। হক্‌=আল্লাহ্‌। মা'রেফৎ =সাক্ষাৎ।

—প্রেমাস্পদই সত্তা, প্রেমিক শুধু খোলস মাত্র। প্রেমাস্পদই জীবন, প্রেমিক (নিজে) মৃত। প্রেমাস্পদ যখন প্রেমিকাকে আর চায় না, প্রেমিক তখন ভগ্নপক্ষ পাখির মতোই হতভাগ্য।

'হালের' ভিতর গভীর ও নিবিড়তম অবস্থার নাম 'মোকাম'। এই অবস্থায় আত্মা ও পরমাত্মার ভিতর লীলাভিনয় ও গোপন-বিহার চলিতে থাকে। রুমী এই অবস্থাটা খলিফা ওমরের মুখে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তুর্কি রাজদূত খলিফা ওমরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া মদিনায় আসিয়াছেন এবং রাজপ্রাসাদ অন্বেষণ করিতেছেন। যখন কোথাও প্রাসাদের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না তখন জনৈক অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—মুস্‌লিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি খলিফা ওমর 'খর্জুরপত্রে নির্মিত' কুটিরে বাস করেন, এবং গৃহপ্রাঙ্গণই তাঁহার মহান দরবার গৃহ। আরো অগ্রসর হইয়া রাজদূত দেখিতে পাইলেন, মহামান্য খলিফা উন্মুক্ত ময়দানে এক খর্জুরবৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছেন। রাজদূত বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া খলিফার বিশাল নির্ভীক জ্যোতিষ্মান্ ললাটের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খলিফার নিদ্রাভঙ্গ হইলে উভয়ে সেই মুক্তপ্রাঙ্গণে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাজদূত 'হাল' ও 'মোকামে'র ভিতর কী পার্থক্য তাই জানিতে চাহিলেন। খলিফা কহিলেন—

'হাল্' চু জলোয়াহ্ আস্ত আযা জী —বা ওরুছ
বী মোকাম আঁ খোলোয়াৎ আমাদ বা ওরুছ
জলোয়াহ্ বীনাদ শাহ ও গায়ের শাহ নিয্
ওয়াক্তে খেলোয়াৎ নিস্ত জুয্ শা —হে আযিয্
হাস্ত বিছীয়ার আহলে হাল্ আয্ সুফীয়ান
নাদের আস্ত আহ্ —লে মোকাম আন্ —দর মিয়ান
—মস্‌নবী।

—'হাল্' শাশ্বত সৌন্দর্যের বাহ্যপ্রকাশ, আর 'মোকাম' ভক্তের সহিত সেই সৌন্দর্যময়ের গোপন অভিসার! বিবাহের ক'নের সজ্জিতরূপ সভাস্থ সকলেই দেখিতে পারে কিন্তু তাহার সহিত ফুলশয্যায় শুধু বরই শয়নাধিকারী। সুফিদের ভিতর হাল অনেকেই আয়ত্ত করিয়াছেন কিন্তু 'মোকামে' পৌঁছিতে পারিয়াছেন কয়জন!

'হাল্' দৈব অনুগ্রহেও পাওয়া যায়, কিন্তু 'মোকামে' উত্তীর্ণ হওয়া কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। 'হালে'র অবস্থা অনেকেই বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন কিন্তু 'মোকামে'র অবস্থা যে বলিতে অধিকারী তাঁহার বর্ণনার অবসর বা আকাঙ্ক্ষা কোথায়? মধুকর যখন মধুপানে রত তখন কি তার গুঞ্জনগীতি শুনা যায়? কোনো-কোনো সুফি অবশ্য চিত্তের চাঞ্চল্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে গূঢ় অনুভূতি বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। মন্‌সুর হাল্লাজ ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি নিজকে 'আনালহক'—অহং-ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর, সেজন্য তাঁহাকে যে-কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, তাহাও রসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। যাঁহারা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন তাঁহারাই উচ্চ অঙ্গের সাধক। রুমী বলিতেছেন—

হুর্ পেন্‌হাম্ আস্ত আন্দর য়ের ও বম
ফাশ আগার গোই —আন্ জঁহা বর্ —হাম যানাম;
বা লবে দম্ —সাযে খোদ গর্ জোফ্‌তামে
হাম্ চু নায় মান্ গোফ্‌তানী হা গোফ্‌তামে।
—মস্‌নবী।

—আমার সত্তা ভিতরে বাহিরে উপরে নিচে সর্বতোভাবে তাঁহার ভিতর নিমজ্জিত। আমি যদি সে গোপন রহস্য প্রকাশ করি, বিশ্ব আজ উলটপালট হইয়া যাইবে। আমার

প্রিয়তমের ওষ্ঠের সহিত যদি আমার ওষ্ঠ সংযোজিত হইত, আমি বাঁশির মতো সকল মর্মকথা গাহিয়া ফেলিতাম।

মস্‌নবী এই পরমার্থ প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার। রুমীর মতে প্রেমই সকল ব্যাধির মহৌষধ। উহা মনকে সকল মলিনতা সকল পাপাসক্তি হইতে নির্মুক্ত করিয়া উহাকে পবিত্র ও উন্নত করে। রুমী বলিতেছেন—

হর কেরা জা   —মা যে এশ্‌কী   পাক শোদ
উ যে হরচ্ ও   আয়েব কুল্লী   পাক শোদ;
শাদ বাশ আয়   এশ্‌ক খোশ্ সও   —দায়ে মা
আর তবীবে   জুম্‌লা ইল্লাত্   —হা মা
—মস্‌নবী।

—যাহার অস্তিত্ব প্রেমের দ্বারা পবিত্রিত হয়, তিনি লালসা ও কলুষ হইতে নির্মুক্ত হন। হে প্রেম, হে আমাদের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী; হে সকল আধিব্যাধির চিকিৎসক, তুমি ধন্য।

পুন.

জেছ্‌মে থাক আয   এশ্‌ক বর আফ্   —লাক শোদ
কুহ্ দর্ রক্‌ছ   আমাদ ও চা   —লাক শোদ
এশ্‌ক জানে   তুর আমাদ   আশেকা
তুর মস্ত ও   খার্রা মুছা   ছায়েকা
—মস্‌নবী।

—প্রেমের গুণেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হইয়াছিল।[১] পর্বত নৃত্যপর ও সচল হইয়াছিল। প্রেমই তুর পর্বতের জীবন সঞ্চার করিয়াছিল ও মত্ততা আনিয়াছিল। তুর তখন মস্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে আর মুছা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান।[২]

প্রেম সাধনা সাপেক্ষ। যাহারা বলে ফকিরি লাভ অদৃষ্টে না থাকিলে ঘটে না, তাহারা রুমীর মতে ভ্রান্ত। মস্‌নবীতে রুমী নিয়তি ও পুরুষকারের সমস্যার অতি সহজ সমাধান করিয়াছেন। তিনি সকল Pantheist-এর মতোই আল্লাহ্‌কে সকল কার্যের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিলেও অপর পক্ষে স্বীকার করিতেছেন যে মানুষকে আল্লাহ্ কতকগুলি কার্যের জন্য এখতেয়ার (স্বেচ্ছাধীনতা) দিয়াছেন এবং সেই এখতেয়ারের বৃত্তের ভিতর মানুষ নিজের পন্থা নিজে নির্বাচনে অধিকারী। এই সকল কার্যের কর্মফলের জন্য মানুষই দায়ী, যদিও কর্মশক্তি ও কর্মক্ষেত্র আল্লাহ্‌ই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। রুমী বলিতেছেন—

দস্ত কু   লরজা বুদ আয্   এরতেয়াস
ওআঁকে দাস্তরা   তু লরজা   —নী যে জাশ
হর্ দো জোম্বাশ্   আফরিদা   হক্ শেনাছ
লায়কে না তাওআঁ   কারদ্ ইঁ, বা   আঁ কেয়াছ
যী পশেমা   —নী কে লর্‌জা   —নীদীয়াশ
চুঁ পশেমা   নিস্ত মরদে   —মোর্‌তায়াশ।
—মস্‌নবী।

—আমরা তো এইভাবে ওতপ্রোতভাবে তাঁহার দ্বারা জড়িত রহিয়াছি কিন্তু তিনি স্বয়ং আলেফ অক্ষরটির মতো একক ও অন্যের নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন।

আল্লাহ্‌র সহিত একাত্মবোধের চরম অভিব্যক্তি এইখানে। সমগ্র মস্‌নবী এই ঝঙ্কারে পরিপূরিত।

---

[১] মেরাজে হজরত মুহম্মদ সশরীরে সমস্ত স্বর্গলোকে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

[২] কথিত আছে হজরত মুছা আল্লা'র স্বরূপ দর্শনের জন্য অত্যন্ত জিদ প্রকাশ করায় দৈববাণী হইল যে আল্লাহ্ তুর পর্বতে মুছাকে দেখা দিবেন। তদনুসারে মুছা তুর পর্বতে অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন আল্লা'র জ্যোতির একটু কণিকা চমক দিল তখনই মুছা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন আর তুর কম্পিত হইয়া ধসিয়া পড়িল।

ফরিদউদ্দীন আত্তার

(১১১৯-১২২৯খৃ.)

কবি এবং দার্শনিকেরা নবযুগের অগ্রদূত হইলেও তাঁহারা পরিপার্শ্বকে একেবারে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরই তাঁহাদের দূরদৃষ্টির আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবু যেমন নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও যে ভূমিতে তাহার শিকড় নিবিষ্ট তাহার প্রভাব সে এড়াইতে পারে না, পাদভূমির গুণাগুণের দ্বারা যেমন তাহার বিকাশ ও ফলপ্রসূ শক্তি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়; মহা মহা ভাবুক ও সত্যদর্শীরাও তেমনি পারিপার্শ্বিক সভ্যতা ও মনোবৃত্তির প্রভাব দ্বারা বিশেষভাবে অভিভূত হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও যাহা তাঁহাদের ভিতরে অভিনব থাকে, সেইটুকুই তাঁহাদিগকে যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া বাঁচাইয়া রাখে।

যুগ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব প্রত্যেক মহাপুরুষের প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই এক যুগের মহাপুরুষের সহিত অপর যুগের কোনো মহাপুরুষের সম্যক্ তুলনা চলে না। যিশু বড়, কি হযরত মুহম্মদ (স.) বড়, কি বুদ্ধ বড়—এই সমস্ত প্রশ্ন এইজন্যই অপ্রাসঙ্গিক। যুগে যুগে জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে; সভ্যতার বিকাশ ও বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কাজেই সাময়িকভাবে ছাড়া, কোনো এক যুগকে সর্বতোভাবে অপর এক যুগ হইতে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক যুগেরই একটা যুগধর্ম থাকে—সেটা হইতেছে মানুষের কল্যাণ। যুগের মানুষেরা সাধারণত সেই আদর্শকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তৃপ্তির সহিত বাঁচিয়া থাকে। সময়ে সময়ে সম্প্রদায় বিশেষ যতই অধঃপাতে যাউক, যুগচিত্ত থাকে সর্বদাই উহার আদর্শে সমাহিত। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তিপ্রবাহের সংগ্রামে কখনো কখনো সমাজের সেই যোগদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যুগদর্শের অনুভূতি তখন নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু উহা কখনই একেবারে লোপ পায় না। যুগসন্ধির অন্তরালে অনাগত কালের প্রতীক্ষায় উহা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং কিছুকাল পরে আবার নব নব মানবের অন্তর-পথে অভিনব আকৃতিতে সাড়া দিয়া উঠে। তখনই নবযুগের সূচনা হয়। মহাকবি আত্তার এইরূপ একজন নবযুগসঞ্চারকারী মহামানব ছিলেন।

ইসমাইলী কবি নাসির খস্‌রু, বৈজ্ঞানিক কবি ওমর খাইয়াম ও তাপস কবি ফরিদউদ্দীন আত্তার একই নিশাপুরে কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের প্রত্যেকের ভিতরই আমরা অসাধারণ প্রতিভার ছন্দদ্যুতি দেখিতে পাই। কিন্তু বিভিন্ন কালচারের প্রভাব তাঁহাদের গতিপথ বিভিন্ন দিকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। ইমাম গায্‌যালি, নিযাম-উল-মুল্‌ক ও হাসান সব্বাহ্ এই যুগেরই অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।[১]

---

[১] নাসির খসরুর জীবনকাল মোটামুটি ১০০৩ হইতে ১১৪৩ খৃ.। ওমর খাইয়াম—১০৪৮ হইতে ১১২৪ খৃস্টাব্দ। ফরিদউদ্দীন আত্তার ১১১৯ হইতে ১২২৯ খৃ.। ইমাম গায্‌যালী ১০৫৮ হইতে ১১১১ খৃ.।

মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে, খৃস্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী একটা বিরাট পরিবর্তনের যুগ। কি ধর্মজগতে, কি নীতিজগতে, কী রাষ্ট্রজগতে, সর্বত্র এই পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছিল। ধর্মপ্রচারের উন্মাদনা তখন থামিয়া গিয়াছে। ইসলাম তখন আপন অধিকৃত স্থানসমূহের আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর। বন্যার বারিধারা যেমন প্রথমে প্রলয়ের শক্তি লইয়া দিকে দিকে ছুটিতে থাকে এবং কিছুকাল ধরিয়া কেবল নব নব ভূমি অধিকার করিয়া চলে, কিন্তু তারপর অগ্রগতি প্রশমিত করিয়া নব মৃত্তিকার সংস্থাপন দ্বারা পাদভূমির উর্বরতা সাধনে নিরত হয়, ইসলামও তদ্রূপ প্রথমে ক্ষিপ্রহস্তে দিকে দিকে আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া পরে দুই শতাব্দী ধরিয়া অধিকৃত স্থানসমূহে রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। আর তাহারই পুণ্যস্পর্শে পূত-স্নিগ্ধ ধরণীর বুকে মুসলিম জাতির রাষ্ট্রীয় গৌরব দিনদিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। শক্তিশালী মুসলিমবাহু রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া নব নব নগরীর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে। জাতির পর জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সুশাসন ও উন্নত সভ্যতার গৌরবদানে নন্দিত করিয়াছে। আটলান্টিকের উপকূল হইতে চিনের পর্বতমালা এবং সাইবেরিয়ার বনানী হইতে আফ্রিকার মরু-প্রান্তর, এ জাতির আজানধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু যে-উচ্ছ্বাসিত ধর্মবিশ্বাসের তড়িৎশক্তি আরবের মরু-সন্তানগণকে মর্তে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল, মদিনার পতনের পর হইতে ক্রমশ উহা হ্রাস পাইতে থাকে। বিজয়গৌরবের বিপুলতার ভিতর মুসলিম জাতির অন্তর হইতে নিষ্কাম ইমানের অমূল্য সম্পদ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতেছিল। বিপ্লবী বন্যাবারির মতোই ইসলাম নবসৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত করিয়া সেই উদাত্ত প্রবাহের অন্তরালে অলক্ষ্যে আপনার সমাধি রচনা করিতেছিল।

আত্তারের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমগ্র মুসলিম-জগতের মনোরাজ্যে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। ধর্মের অন্তঃসারকে বিদায় দিয়া তাহার খোলস লইয়া যাজকগণ মারামারি করিতেছিলেন। শাস্ত্রাদেশের দোহাই দিয়া মানুষের উপর তাঁহার অত্যাচারের খড়্গ চালাইতেছিলেন। রাজশক্তি তখন অন্ধ মেশিনের ন্যায় উঁহাদের কপোলকল্পিত বিধিনিষেধের আজ্ঞানুসরণ করিত। ফলে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের স্ফূর্তি মুসলিম প্রদেশসমূহ হইতে নির্বাসিত হইতেছিল। মানুষের অন্তরে যে সুপ্ত আত্মা বিরাজ করিতেছে সে ভিতরে ভিতরে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রত্যেক কার্যেরই প্রতিক্রিয়া আছে। বিধিনিষেধের অতিরিক্ত চাপে মুসলিম-জগতের চিন্তারাজ্যে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠে। আরবভূমিতে এই বিদ্রোহের অভিব্যক্তি হয় মুতাযিলা দর্শনে ও ইসমাইলি মতবাদে। এই দুইটি কালচারের ধারাই পারস্যে আসিয়া বিপুলায়তন লাভ করে। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পারস্য-কবি নাসির খসরু ছিলেন ইসমাইলি দলের মুখপাত্র, আর ওমর খাইয়াম ছিলেন মুতাযিলাপন্থী পণ্ডিতগণের ঋত্বিক। এই দুইটি শক্তিশালী মানবে এইরূপে দুইটি বিভিন্ন কালচারের ধারা আসিয়া অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এই দুইটি সম্প্রদায়ই তদানীন্তন শাস্ত্রানুগতিক মুসলিমদিগের মতের পরিপন্থী (reactionary) ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী এই শাস্ত্র-বিদ্রোহের অবসানের পর আবার যে নব আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয় তাহার প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল মহাকবি আত্তারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে মার্জিত ও সংযত সুফিমত মহাকবি সা'দিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আত্তারে তাহার সূচনা। এই সময়ে ভাবী উন্নত সুফিমতের যে চর্চারম্ভ হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ

শতাব্দীতে উহা পরিপুষ্ট হয়। তাহারই উজ্জ্বলতম সৃষ্টি হাফেজ, জালালউদ্দীন রুমী ও আবদুর রহমান জামী।

পূর্বের সূর্য পশ্চিমে যায়। এশিয়ায় ওমর খাইয়ামের যুগে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চা পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহার পর প্রাচ্য ভূখণ্ডে সে বিদ্রোহ-তেজ মাধ্যাহ্নিক রেখা অতিক্রম করিয়া ক্রমশ মন্দীভূত হইতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে তখন এই কালচার ইবনে রুশদ প্রমুখের চেষ্টায় উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভই করিতেছিল। এশিয়ায় শাস্ত্রদ্রোহের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন আল গায্যালী (১০৫৮-১১১১খৃ.)। আলিমশ্রেষ্ঠ আল গায্যালী বিজ্ঞানপন্থী দার্শনিক হইয়াও শাস্ত্রানুশাসনের সংরক্ষক ছিলেন। তিনি যে শাস্ত্রানুমোদিত দর্শনের প্রবর্তন করিয়া যান, সুপ্রসিদ্ধ হাকিম সানায়ী তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ওমর খাইয়াম প্রমুখ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবর্তিত বিপরীত প্রভাব সত্ত্বেও উহার গতি ক্রমশ অগ্রগামীই হইতেছিল। আর এই নবপ্রেরণাকে পূর্ণরূপে শক্তিশালী করিয়াছিল তাপস-কবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের গভীর সাধনা। আত্তারের যোগ সাফল্যের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাসমূহ বিপুল শক্তিতে মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরই ইসমাইলি মতের উপর সুফিমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্তার শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু ইসমাইলি মতের সমর্থক ছিলেন না। বিজ্ঞানপন্থীদের অনুসন্ধিৎসা পূর্ববৎ রহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাদের শাস্ত্রদ্রোহিতা আর পূর্বের ন্যায় থাকিল না। তাঁহারা সুফিসাধনার রসসমুদ্রে বিস্ময়-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

মোটামুটি এ-কথা বোধহয় বলা যাইতে পারে যে ওমর খাইয়াম প্রমুখ পণ্ডিতদের সৃজিত বৈজ্ঞানিক কালচারের ধারা যুগ্ম হইয়া যায় এই আত্তার ও তাঁহার উত্তরসুরিদের জীবনে। নিশাপুরের বুলবুল ওমরের ছায়াস্পর্শ কখনো আত্তারের দেহে নিপতিত হইয়াছিল কি না জীবনাখ্যায়কগণ তাহা লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক সাধনা সে-যুগকে আলোকিত করিয়াছিল তাহার রশ্মি অবশ্যই আত্তারকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

এ যুগে যে-তিনজন শক্তিশালী তাপস-কবির লেখনী প্রভাবে পারস্য-সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিয়াছিল, কাল হিসাবে তাঁহাদের মধ্যে আত্তারের স্থান মধ্যবর্তী। অপর দুই ব্যক্তি হইলেন হাকিম সানায়ী ও মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী। সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক-গ্রন্থ 'মসনবীর' রচয়িতা মহাকবি জালালউদ্দীন স্বয়ং লিখিতেছেন—

"আত্তার রূহ বুদ ও সানায়ী দো চশ্‌মে উ—
মা আয পায়ে সানায়ী ও আত্তার আমাদেম।"

—আত্তার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রাণ; সানায়ী উহার দুটি চক্ষু। আমি আত্তার ও সানায়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি মাত্র।

হাকিম সানায়ী

সানায়ীর প্রকৃত নাম মাহমুদ। সানায়ী তাঁহার উপাধি। লোকে তাঁহাকে হাকিম সানায়ী বলিয়া অভিহিত করিত। হাকিম অর্থ দার্শনিক। সানায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গজনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কবিত্বের যশ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইলে সম্রাট বাহরাম শাহ্ তাঁহাকে সাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন। সানায়ী বাহরাম শা'র রাজসভায় দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং তদীয় গৌরব-রক্ষার্থ অনেক কাসীদা রচনা

করেন । পরিশেষে সানায়ীর জীবনে হঠাৎ এমন এক মুহূর্ত আসিল যখন তিনি অকস্মাৎ রাজস্তুতি ও কাসীদা রচনা বর্জন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন ।

সানায়ী বিবাহ করেন নাই । ধনৈশ্বর্য কোনোদিন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই । তিনি নগ্নপদে ও অনাবৃত মস্তকে মক্কাতীর্থে গমন করিয়া হজব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং শেষজীবনে গজনীতে নির্জনবাস ও সাধনায় দিনপাত করেন । নগরের কঙ্করময় রাজপথেও তিনি নগ্নপদে বিচরণ করিতেন । নাগরিকগণ তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইত কিন্তু তিনি কাহারো উপঢৌকন গ্রহণ করিবার পাত্র ছিলেন না । কেহ তাঁহার সেবা করিতে চাইলে তিনি ধন্যবাদসহ তাহাকে বিদায় করিতেন । (আর একালের পীরগণ!) তিনি বলিতেন, যে সংসার-বিরাগী সে কেন অপরের অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়া আল্লা'র বিরাগভাজন হইবে ।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সানায়ী ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি অতি উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন এবং তাসাউফের নানা দিক অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন । তন্মধ্যে কেবল 'হাদিকা' অধুনা মুদ্রিত দৃষ্ট হয় । ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ রচনা ।

আত্তারের বাল্যজীবন

আবু তালেব মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন আত্তার নিশাপুরের এক আতর-ব্যবসায়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । এজন্য তাঁহার উপাদি আত্তার । কিন্তু ফরিদউদ্দীন নিজে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ঔষধাদি বিক্রয় করিতেন । নিশাপুর আরো অনেক কবিরই সূতিকাগার বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ ওমর খাইয়ামও এই নিশাপুরের মুক্ত প্রকৃতির এক বিদ্রোহী সন্তান, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । শুধু তাই নয়, নিশাপুর শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবেও মধ্যএশিয়ার একটি উন্নত কেন্দ্র ছিল । আত্তারের জীবনকুসুম এইখানে উন্মেষিত হয় এবং নানা দিগদেশে সুরভি বিতরণ করিয়া পরিশেষে আবার এইখানেই বৃন্তচ্যুত হয় ।

আত্তার কোন্ সনে ভূমিষ্ঠ হন তাহা নির্দিষ্ট নাই । খোরাসানের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সঞ্জর ১১৫৭ খৃস্টাব্দে নিশাপুরে পরলোকগমন করেন ।[১] মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা (land mark) । ইহার অল্পকাল পূর্বে আত্তারের আবির্ভাব, তবে ঠিক কত পূর্বে তাহা জানা যায় না । শৈশব হইতেই আত্তারের জীবন গভীর ধর্মভাবে প্রণোদিত ছিল । কৈশোর হইতে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি শিক্ষা ব্যাপদেশে ইমাম রেযা নামক জনৈক সিদ্ধ তাপসের দরগাহে অতিবাহিত করেন ।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আত্তার দেশভ্রমণে বহির্গত হন । এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী প্রচলিত আছে । হেকিম হিসেবে আত্তারের খ্যাতি হইয়াছিল যথেষ্ট । তাঁহার দাওয়াখানাও ছিল বৃহৎ ও সুসজ্জিত । প্রতিদিন অসংখ্য রোগীর রোগ নির্ণয় ও ঔষধ বিধান করিয়া অবসর সময় এইখানে বসিয়াই তিনি কাব্য রচনা করিতেন । দার্শনিক চিন্তা, কবিতার রেশ, আর সেইসঙ্গে অর্থাগমন ও খ্যাতি এইসব মিলিয়া তাঁহার জীবনকে করিয়াছিল পরম মনোরম । কিন্তু হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনায় সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল । কোথা হইতে আসিল এক অজানা ভিক্ষুক । একদিন সে তাঁহার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুসজ্জিত ঔষধপত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; আত্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আগে বাড়ো । ভিক্ষুক এই অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—আমি তো যাচ্ছি, তুমি তোমার নিজের দিকে নজর কর । এই বলিয়া ভিক্ষুক সেইখানেই ভূমিতে শুইয়া পড়িল

---

১. সঞ্জরের রাজত্বকাল ১১১৮-৫৭ খৃ. ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আত্তার বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন এযাবৎ তিনি যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কী সে শক্তি যাহার বলে মানুষ এমন করিয়া ইচ্ছামাত্রেই দেহখানিকে জীর্ণবস্ত্রের মতো ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে! পাণ্ডিত্যাভিমান, সংসার ও অনিত্য বৈভব, এ সমস্তের মায়া কাটাইয়া আত্তার শাশ্বত সত্যের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিলেন।

মুসলিম জগতে সফর একটি পবিত্র জিনিস।[১] সে যুগে সফর না করিলে লোকের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইত না। আত্তার রে, কুফা, মিসর, দামেস্ক, মক্কা, জুডা, তুর্কিস্থান, ভারতবর্ষ ইত্যাদি বহুদেশ পর্যটন করেন। ঐ সকল দেশের ভ্রমণ তাঁহাকে নানা দেশের সাধকমণ্ডলীর সংসর্গ লাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। সুদীর্ঘ ঊনচল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি সাধুপুরুষদিগের মূল্যবান রচনাবলি সংগ্রহ করেন। এই দীর্ঘস্থায়ী অধ্যবসায় ও অধ্যাত্মচর্চা তাঁহার জীবনকে পূতস্নিগ্ধ ও উন্নত করিয়াছিল। এইরূপে যোগ্যতা অর্জনের পর তিনি লোকশিক্ষার জন্য লেখনী চালনায় প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে স্বয়ং প্রভু মুহম্মদ (স.) তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া এ-কার্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পবিত্র কুরআনের সুরার সংখ্যা ১১৪। আত্তারও মোট ১১৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৩০ খানি অধুনা বর্তমান আছে। পান্দনামা (হিতোপদেশ), মন্তেক-উৎ-তায়ের (পাখির বচন), তাযকিরাতুল আউলিয়া (সাধুপুরুষদিগের জীবনী), উশ্‌তার (উষ্ট্র) নামা, মুছিবত নামা, লেসানুল গায়েব (অদৃশ্য কণ্ঠ), মযহার উল আজায়েব (গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ) ইত্যাদি আত্তারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আত্তারের সকল গ্রন্থই অতি উচ্চ আদর্শ লইয়া রচিত। জীবনে কাহারো স্তুতিগাথা তিনি রচনা করেন নাই।

নির্বাসন

মহাকবি জালালউদ্দীন রুমী যাঁহাকে সুফিজগতের রুহ অর্থাৎ প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং নিজকে যাঁহার সামান্য একজন পদাঙ্ক অনুসরণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই তাপসগুরু ও কবিশ্রেষ্ঠ ফরিদউদ্দীন আত্তারকে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার নিকট যে কী বিষম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। জীবনাপরাহ্নে কবির আত্মা যখন মুক্তির জন্য ব্যাকুল—কোথা পথ, কোথা পাথেয়, কোথায় কাণ্ডারী, এইসব যখন তাঁহার চিন্তা—সেই সময় কবির প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'মযহার উল্ আজায়েব' প্রকাশিত হয়। ধর্মজীবনে মানুষের যে-সমস্ত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই সম্বন্ধে কবি এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী, তাই

---

[১] মুসাফিরকে মুসলমান মাত্রেই শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকে, তা তিনি যে দেশের বা যে সম্প্রদায়েরই হউন। মুসলিমের নিকট মুসাফিরের সম্বন্ধে কোনোপ্রকার ভেদ বিচার নাই। তাই কর্পদক মাত্র সঙ্গে না লইয়াও যে কেহ মুসলিম দেশসমূহে অবাধে পর্যটন করিতে পারেন। (অবশ্য রেল বা যানবাহনাদি আরোহণ করিলে তাহাকে সে ব্যয় বহন করিতে হইবে)। মুসলিম পর্যটকদের আরো বিশেষ সুবিধা এই, পশ্চিম দেশের প্রত্যেক নগরীতেই মসজিদের সঙ্গে মুসাফিরখানা সংস্থাপিত আছে। পথবাহীরা কাহারো দ্বারস্থ না হইয়া অক্লেশে এই সকল মুসাফিরখানায় আহার্য ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন। 'আসসালামো আলায়কুম' ইহাদের একমাত্র পাসপোর্ট। এই একটিমাত্র সম্ভাষণ দ্বারা ইহারা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মুসলমানের নিকট সহজেই পরিচিত হন এবং পরম আদরে অভ্যর্থিত হন। ইসলামি সভ্যতার ইহা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান।

তদীয় হযরত আলীর প্রতি প্রশংসা বর্ষিত হইয়াছিল অত্যধিক। অতীত যুগের কোনো মানুষের প্রতি প্রশংসা বর্ষণে কাহারো কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু যেকালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন শিয়া-সুন্নিতে প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছিল। শিয়া সম্প্রদায় হইতে উদ্গত 'ইসমাইলি' দলের ফকিরগণ তখন দেশে অনাচার ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছিল। এই সকল কারণে মধ্যএশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি সম্প্রদায় তখন বিষম ধর্মোন্মত্ততায় কুর্দন করিতেছিল। আত্তারের অমূল্য গ্রন্থ তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া বরং ক্রোধেরই উদ্রেক করিল। কেননা, কবি যাঁহাকে গভীরতম শ্রদ্ধায় নন্দিত করিয়াছিলেন সেই হযরত আলী ছিলেন শিয়াদিগের ধর্মাদর্শ ও ইসমাইলি দলের পয়গম্বর স্বরূপ।

'মযহার উল্ আজায়েব' যদি সুন্নি সমাজে শুধু অবজ্ঞা লাভ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত, তাহা হইলে কবি নিজের ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। সমরখন্দের এই মৌলানা পুণ্য সঞ্চয় মানসে তাঁহার নামে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। স্থানীয় তুর্কি শাসনকর্তা বারবাকের আদেশে কবির প্রিয় গ্রন্থ ভস্মীভূত হইল। কবি নিজেও নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

মৌলানার দল মূর্খ জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া দিল। নিষ্ঠুর দানব-দলনে কবিকুঞ্জ অচিরে নিষ্পেষিত ও ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কবির যা-কিছু ছিল সমস্তই লুণ্ঠিত হইল। রিক্ত ব্যথিত কবি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন! কিন্তু কোথায় যাইবেন! কোথায় গেলে তাঁহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে! নানাদিক চিন্তা করিয়া কবি স্থির করিলেন, যে পূতকেন্দ্র হইতে বিরাট ইসলাম-তরু উদ্ভূত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তির ছায়া বিস্তার করিয়াছে, যেখানে পাপীতাপীর আশ্রয়স্থল আল্লার পবিত্র কা'বা অবস্থিত, সেই মক্কা নগরীই হয়তো তাঁহার ভগ্নহৃদয়কে শান্তিধারায় নিষিক্ত করিতে পারিবে। মরুদেশের শীতল নির্ঝর ও খর্জুর ছায়ার অন্বেষণে কবি রুদ্ধ হাহাকার হৃদয়ে চাপিয়া যাত্রা করিলেন।

মক্কা নগরীতে কবির শেষগ্রন্থ 'লেছান উল্ গায়েব' রচিত হয়। 'লেছান্ উল্ গায়েব' অর্থ অদৃশ্যকণ্ঠের বাণী। বড় সার্থক হইয়াছিল এই নামটি। কেননা এই গ্রন্থের সুরের ভিতর দিয়া কবির কণ্ঠ জগৎ শুনিতে পাইল, কিন্তু কবি নিজে রহিলেন গোপন, তাঁহার বেদনা অশ্রুনীরের অন্তরালে। কবি এই সময় নিজের অদৃষ্টের তুলনা করিয়াছেন তাঁহারই অবস্থাপ্রাপ্ত আর একজন মহাকবির দুঃখময় জীবনের সহিত। এই কবির নাম নাসির খসরু বলখী। নাসির খসরু ইসমাইলি মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই লোকে তাঁহাকে তাঁহার মতবাদ উল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে। প্রাণের আশঙ্কায় কবিকে শেষজীবনে ছদ্মবেশে দেশে দেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভান্বিত জীবনের এই বিড়ম্বনা দেখিয়া আত্তার তাঁহাকে বদখ্শানের গভীর অরণ্যে লুক্কায়িত পদ্মরাগ-মণির সহিত তুলিত করিয়াছেন। আত্তারের নিজ জীবনের প্রতিও একটা আবেগময় ইঙ্গিত ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেননা তিনিও প্রতিভায় ভাস্বর স্বরূপ হইয়াও মক্কায় জনসমুদ্রের নিবিড়তার ভিতর তখন আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিলেন। অগণিত আঁখি হইতে তাঁহার বেদনায় আজ অশ্রু ঝরিতেছে; কিন্তু ধর্মান্ধতা এমনই ব্যাধি যে, সে-যুগের মুসলিমদের মায়ামমতা উহা নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনের শেষদিকে কবি নিশাপুরেই অবস্থান করিতেন। কেহ কেহ বলেন তিনি সত্তর বৎসরের ঊর্ধ্বকাল জীবিত ছিলেন এবং ১১৯৩ অথবা ১২০০ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কাহারো কাহারো মতে তাঁহার আয়ুষ্কাল একশত চৌদ্দ বৎসর এবং ১২২১ খৃস্টাব্দে তিনি মোগলদিগের হস্তে নিহত হন। বিখ্যাত কবি মোল্লাজামী এবং দৌলতশাহ শেষোক্ত মতের

পক্ষপাতী। ১২২৯ সনে দুর্দান্ত মোগল বাহিনী কর্তৃক নিশাপুর লুণ্ঠিত হয়, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। বর্বরদিগের নিকট পণ্ডিত-মূর্খ, পাপী-নিষ্পাপ, সকলেই সমান। অতএব আত্তার যদি ১২২৯ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া থাকেন তবে সেই প্রবৃদ্ধ অবস্থায় দুর্বৃত্ত মোগল সৈন্যগণের হস্তে তাঁহার নিহত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর যাহাদের জন্ম হয় তাঁহাদের জীবন প্রায় অশান্তিতেই অতিবাহিত হয়। শক্তিশালী মানবেরা অনেক সময় তাঁহাদের অসাধারণ আত্মবলের দ্বারা যুগশক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া উহাকে নিজ আদর্শের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহারা প্রায়ই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের পরবর্তী চিন্তানায়কেরা তাহার উপকার উপভোগ করিয়া থাকেন। এদেশের মহাত্মা রামমোহনের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আত্তারের পরিপার্শ্ব যে আমরণ তাঁহার প্রতিকূল ছিল, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনায় তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে। তাঁহার জীবন ছিল যোদ্ধার জীবন। তিনি অসিযুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু আমরণ পারিপার্শ্বিক বর্বরতা, অজ্ঞতা ও ধর্মদ্রোহিতার সহিত যুঝিয়া যুঝিয়া পরিশেষে নিষ্ঠুর বর্বরতার কবলেই সম্ভবত শহীদ হইয়াছেন। এইরূপে তিনি যুগের সুপ্তপ্রাণে চেতনার সঞ্চার করিয়াছিলেন, ধর্মোদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেককে জাগ্রত করিয়াছিলেন। পাপ-তাপ-কলুষ জর্জরিত জগৎ তাঁহার আত্মত্যাগের মহিমায় শোধিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনরায় এক সুস্থ জীবনের দিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল।

মন্তেক-উৎ-তায়ের

আত্তারের দার্শনিক গভীরতার পরিমাপ করিতে হইলে, তদীয় 'মন্তেক-উৎ-তায়ের' গ্রন্থ পাঠ করা দরকার। রূপকের ভিতর দিয়া কবি এই গ্রন্থে আত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিসাহিত্যে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ওজস্‌সম্পন্ন পয়ার ছন্দে লিখিত এবং মসনবী নামক কাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে ইহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল—

ত্রয়োদশ প্রকার বিহঙ্গম একত্রিত হইয়া যুক্তি করিল, তাহারা পুরাবৃত্তের প্রসিদ্ধ পাখি সীমোরগের সন্দর্শনে যাত্রা করিবে। কল্পলোকের কোন্ মহিমান্বিত রাজ্যে উহার বসতি তাহা কেহ জানে না। উহার কোন্ কলাপের ছায়াসম্পাতে ইন্দ্রধনুর বঙ্কিম চূড়া মেঘলোকে রাঙিয়া উঠে, তাহার মীমাংসায় নাকি আজিও চিনদেশের চিত্রকরেরা বিব্রত। যাত্রীর দল হুদহুদ নামক প্রসিদ্ধ পাখির নেতৃত্বে এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইল। দৌত্যকার্যে এই হুদহুদের খ্যাতি প্রাচীন কাহিনীতে সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে সাফা শহরের রাজ্ঞী বিলকিসের নিকট বাদশাহ সোলায়মানের প্রণয়বার্তা বহন করিতে এই হুদহুদই একদা ইয়েমেন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল।

কিন্তু যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বুলবুল বলিল—সে যদি দেশত্যাগী হয়, তাহার প্রিয়সখী গোলাবের কী দশা হইবে। ফুলশাখায় সে দোল না দিলে গোলাব-কুঁড়ি যে আঁখি মেলে না। তোতা কহিল—অত রূপ তাহার দেহে, যেখানে যায় সেইখানেই তার বিপদ। ময়ূর নাকি আদিপিতা আদমের স্বর্গচ্যুতির সম্পর্কে কীভাবে কলঙ্কভাগী হইয়াছিল, তাই তার ভবিষ্যতে পুণ্যলাভের কোনো আশা নাই। হংস ছিল সরসীর মায়ায় আবদ্ধ। বক চাহে জলাভূমি। তিতির চায় পার্বত্য উপত্যকা। পেচক চায় পতিত ধ্বংসের স্তূপ। হুমা পাখির কার্য মানুষের উপর ছায়াপাত দ্বারা রাজভাগ্য অর্পণ করা। বাজ দক্ষ শিকারি, তাই সে রাজার প্রিয়। দোয়েল ক্ষীণাঙ্গী ও দুর্বল। সুতরাং দেখা

গেল আপাতত কেহই প্রবাসে যাইতে সমর্থ নয়। কিন্তু বিচক্ষণ হুদহুদ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা একে একে সকলেরই আপত্তি খণ্ডন করিল। প্রবুদ্ধ যাত্রীর দল তখন নিরুদ্দেশ যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিল।

তাহারা একে একে সপ্ত উপত্যকা অতিক্রম করিল। প্রথম উপত্যকার নাম প্রেম। তৎপর জ্ঞান; জ্ঞানের পর নির্লিপ্ত। আরও ঊর্ধ্বে যোগ-উপত্যকা; যোগের ভিতর দিয়া তাহারা বিস্ময়ের স্তরে উন্নীত হইল। তখন ভূলোক আর বড় দেখা যায় না। জ্যোতির্লোকের রেশ দৃষ্টিতে পড়িতেছে! সে কী আশ্চর্য জগৎ! তারপরই ত্যাগের স্তর; এখন আর পার্থিব কিছুর আকর্ষণ নাই। তারপর সপ্তম স্তর—নাম আত্মবিনাশ। এইখানে যাত্রীরা অহংজ্ঞান বিসর্জন দিল। নফ্‌স্ বা ব্যক্তিত্ব তখন জীর্ণ খোলসের ন্যায় খসিয়া পড়িল। যাত্রীরা আত্মপর বিস্মৃত হইয়া এক নবজীবনের আস্বাদ লাভ করিল। সুফিদের ভাষায় ইহাই ফানা–ফিল–লা'র জগৎ।

ফানা–ফিল–লা'র এই নিষ্কাম জগতে তাহারা আকাঙ্ক্ষিত সী-মোরগের সাক্ষাৎ লাভ করিল। কঠোর সাধনায় তাহাদের আত্মশুদ্ধ, স্নাত ও অহংনির্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দেখিতে পাইল ভাস্বর জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর, যাহার অন্বেষণে তাহারা কত মরুকান্তার গিরিনদী লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে এবং বিসর্জনের পথে জীবনকে কোরবানি করিয়াছে। অপূর্ব বিস্ময়ে তাহারা দৃষ্টিকে সংহত করিল। কিন্তু তারপর তাহারা যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না। তাহারা দেখিতে পাইল, সী-মোরগ শুধু সম্মুখে নয়! যার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে-ই সী-মোরগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দ্রষ্টা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে, দেখে সে-ও সী-মোরগ। কাহাকে দেখিতে আসিল আর কে দেখিতে আসিল তাহার কোনো নির্ণয় রহিল না। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিল প্রকৃত সী-মোরগ কে? দৃষ্ট আর দ্রষ্টা, তুমিত্ব আর আমিত্ব, সবই একাকার হইয়া গেল। দ্বৈত-সাপেক্ষতা যেন স্বপ্নের ব্যাপারে পরিণত হইল। যাত্রীর দল এ রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া মনে মনে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন ভাষাহীন বাণীতে ঘোষিত হইল—হে সত্যান্বেষী পথিক, এ দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিতেছ! সত্য সী-মোরগ তোমার অন্তরে! দৃষ্টিভ্রমে এককে বহু দেখিতেছ!

যে-যুগে আত্তার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনকার সমাজ তাঁহাকে বুঝিবার মতো ধীসম্পন্ন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওমর খাইয়ামের কাব্যপ্রতিভাও সে-যুগে স্বদেশে অনাদৃত হইয়াছিল। তাঁহারই পরবর্তী কবি এই আত্তার। তাঁহার জীবনেও দুর্ভাগ্যের সীমা ছিল না। তাঁহার দেহত্যাগের অর্ধশতাব্দী পর হইতে লোকে তাঁহার মর্যাদা বুঝিতে আরম্ভ করে। তাই দেখি, ঋষি জালালউদ্দীনের শিষ্যেরা তাঁহাকে আত্তারের ললিত ভাষায় সানায়ীর তত্ত্বজ্ঞান মিশ্রিত করিয়া কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিতেছে। আর তাহারই ফলে রচিত হয় তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'মসনবী'। জালালউদ্দীন বলিয়াছেন—

হাফ্‌ত শহরে এশকরা আত্তার গাশত;
মা হনুয আন্দর গমাকে কুচা'য়েম।

—আত্তার সাধনার সপ্তরাজ্য পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। আর আমি এখনো আঁধার গলিতে ঘুরিয়া মরিতেছি!

আত্তারের মসনবী

শুধু ললিত ছন্দই আত্তারের কাব্যের বিশেষত্ব ছিল না, তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়াও আত্তারের তুলনা বিরল। তাঁহার মসনবীর প্রথমেই যে অনবদ্য স্তবের সূচনা হইয়াছে, নিম্নে তাহার

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

এফ্‌তেদাহ নামহা আয় নামে তু—
হার দো আলম জুর্‌আ'নুশ্‌ আয জা'মে তু।
আঁ খোদাওন্দী! কে দর আয়েজে ওজুদ
হার যর্মা খোদরা বা-নকশে ওয়া নমুদ।

—যাবতীয় নামের আরম্ভ তোমারই নাম হইতে। তোমার সুধাপাত্রের বিন্দুমাত্র পানে উভয় জগৎ পরিতৃপ্ত।

—তুমি সেই সর্বাধিরাজ যিনি এই দৃশ্যমান শরীরী-জগতের প্রকাশভূমিতে প্রতি যুগে নব নব রূপে নিজকে প্রকাশিত করিতেছে।

জুমলা যাতে জাঁহা মোর্' আতে উস্ত;
হার্‌চে বীণী মোছহাফে আয়াতে উস্ত।
গারকায়ে আব আন্দ ও মা জুইয়াদ আব!
বে'খোদ আয মাস্তী ও গোইয়াকো শারাব!

—বিশ্বের যাবতীয় অস্তিত্ব তাঁহার মুকুর। যা-কিছু দেখিতেছ সমস্ত তাঁহারই প্রকাশ-চিহ্ন।

—জলে নিমজ্জিত থাকিয়াও জল খুঁজিতেছ! শারাবে মাস্ত, তবুও বলিতেছ, কোথায় শারাব!

আতশে দর তলব দর দিল্‌ ফরুয;
হার চে ইয়াবী গায়ের-মতলব, আঁ বে' সুয্‌।

—পাওয়ার আকাঙ্ক্ষারূপ অনলকে অন্তরে প্রজ্বলিত কর। অবাঞ্ছিত যা-কিছু পাও, জ্বালাইয়া দাও।

যোগ ও সমাধি-স্তরে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর গ্রামে উঠিতে উঠিতে সাধক-কবি 'মারাকাবায়' অর্থাৎ ধ্যানমগ্নাবস্থায় ক্রমে আত্মহারা হইয়াছেন এবং আল্লা'র সহিত একাত্ম হইয়াছেন। ইহার পর যে-বাণী তাঁহার মর্মতল হইতে গযলের সুরে উদ্‌গত হইয়াছে তাহা তত্ত্বকথার চরম। কবি যোগাবস্থায় নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তু ব'মানী, জানে জুম্‌লা আলমে—
হার দো আলম খোদ তুয়ী, বে'নেগারদে।
"লাও হে মাহফুয" আস্ত. দর মা'নী, দিল'য়াৎ;
হারচে মী'খাহী, শুদ যে উ হাসেলাত।

—আসলে তুমিই সমগ্র জগতের প্রাণ। তুমিই উভয় জগৎ, বুঝিয়া দেখ।

—তোমার চিত্তই প্রকৃত প্রস্তাবে 'লাওহে মাহফুয' (আকাশ-তল, যেখানে আল্লা'র বাণী লিখিত ছিল)। তুমি যা-কিছু চাও, উহা হইতেই তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

দর হকিকৎ খোদ তু'য়ী 'উন্মুল কিতাব'—
খোদ যে খোদ আয়াতে যাব ইয়াব।
ছুরাতে নক্‌শে এলাহী খোদ তু'য়ী।
আরিফে আশিয়া কামাহী খোদ তু'য়ী।

—আসলে তুমিই পবিত্র কুরআন। তুমিই নিজে নিজের ভিতর নিজ প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য কর।

—নকশে এলাহির তুমিই প্রতিকৃতি। বস্তুসমূহের আসল স্বরূপের তুমিই পরিজ্ঞাতা।

উনচে মতলুবে জাহাঁ শুদ, দর জাহান,
মাহ তু'য়ী ও বায জোও আয খোদা নেশান।
"মান আরেফ্‌" যে আঁ গোফ্‌ত শাহে আউলিয়া,
আরেফে খোদ শোও কে' বে'শেতাছী খোদা।

—যিনি এই বিশ্বে সারা জাহানের কাম্য, তুমি সেই। তোমার নিজের ভিতর তাঁহার সন্ধান লও।

—এজন্যই শাহে আউলিয়া (আলী) বলিয়াছেন, নিজকে চেনো। নিজকে জানিলেই খোদাকে জানা হইবে। (এখানে হযরত আলীর সেই বিখ্যাত বাণী 'মান্ আরাফা নাফ্সাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'-এর ঝঙ্কার রহিয়াছে)।

আবার কবি যখন যোগ-অবচ্ছিন্ন হইয়াছেন তখন পুনঃ আত্মসম্বরণ করিয়াছেন এবং ধ্যানলোক হইতে চিন্তাজগতে প্রয়াণ করিয়াছেন। তখন আর পরমাত্মার সহিত একাত্মবোধের অভিব্যক্তি নাই। কবি তখন তাঁহার প্রেমাস্পদকে শুধু অন্তরতম সখা-ভাবে সম্বোধন করিতেছেন—

গার হামী খাহী কে বীনী রুয়ে দোস্ত,
দিল্ ব'দস্ত আওয়ার কে দিল্ মীরাসে উস্ত।

—যদি বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইতে চাও, নিজের দিল্‌কে করায়ত্ত কর। এ দিল্ তাঁহারই মিরাস (সম্পত্তি)। (তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ইহার খোঁজে আসিতেই হইবে)।

এশক চে বুদ? কাৎরা দরীয়া ছাখতান,
আয দো আলম বা খোদা পোর দাখতান।
কাৎরা দর দরিয়া ফিতাদ ও শুদ ফা'না
আ ইঁ দরীয়া গাশ্তানাশা বা'শাদ বা'কা।

—প্রেম কী? প্রেমের কাজ বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করা এবং উভয় জগতের ভিতর একমাত্র খোদাতে চিত্তকে সমাহিত করা।

—বারিবিন্দু সিন্ধুতে পড়িয়া লীন হইয়া যায়। এইরূপে সাগরে পরিণত হইয়াই তাহার পক্ষে শাশ্বত জীবন লাভ।

মানুষ আলো ও অন্ধকারের সমাহার। অবিনশ্বর আত্মার সে অধিকারী। সেই আত্মা আদিনূরের অংশ, তাই জ্যোতির্লোকের আলোকতরঙ্গ তাহার সুপ্ত অন্তরে জাগায় অনুভূতি। আবার জৈব দেহের কারণে সে ষড়রিপুরও অধীন! হিংসা, কাম ও জিঘাংসা তাহাকে সর্বদা টানিতেছে এক ইতর তামসিকতার দিকে। একদিকে দিব্যজ্ঞানের শুভ্র রজতধারা, অপরদিকে বিবেকহীনতার গাঢ় কৃষ্ণ কুহেলিকা। মধ্যস্থলে মানব! অন্ধকার আলোককে গ্রাস করিবে, না আলোকে অন্ধকার বিলীন হইয়া যাইবে? আশাবাদী কবি বলিতেছেন—

হাস্ত এনছান বারযাখে নূর ও জুলম;
"মাৎলা এল্ ফাজ্‌রাশ"শ্ আয-ই গোফ্‌তান্দ হাম।

—আলো ও অন্ধকারের সন্ধিস্থলে মানুষ যেন এক সীমা-গিরি। তাই তাহাকে উষার উদয়াচল বলা হয় (যেখানে শুধু আলোকের জয়যাত্রা)।

মী'নমায়েদ ছায়াহা আয আক্‌ছে নূর;
ছায়া রা আয নূর না তাওয়াঁ কার্‌দ দূর।
গার নেহান্ গার্‌দ যমানে নূর খোর,
ছায়াহা না-চীজ গারদাদ সর-বসর।

—আলো যে বস্তুতে পড়ে তারই অন্তরালে দৃষ্ট হয় ছায়া। আলো হইতে ছায়াকে দূরে সরানো যায় না।

—কিন্তু সূর্যকর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিলে (উর্ধ্বতর স্থলে পৌছিলে, যেমন মধ্যাহ্নে) ছায়া লয়প্রাপ্ত হয়। (সাধনার উর্ধ্বতম স্তরে পৌছিলে মানুষের অন্তরও পূর্ণরূপে আলোকময় হয়)।

আত্তার ও মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি

যে কালে আত্তারের মর্মবাণী ইরানের দিকচক্রবাল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল, সেই সময় আর-একজন মুসলিম সাধক দুস্তর ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দিল্লির পথে আজমিরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি। ইহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক, তাপসশ্রেষ্ঠ শেখ আবদুল কাদির জিলানী (বড় পীর) ইহার অল্পকাল পূর্বে (১১৬৫ খৃ.) বাগদাদে দেহত্যাগ করেন। খৃস্টীয় ১২০০ অব্দের পূর্ব হইতে খা'জা মঈনউদ্দীন হিন্দু-অধ্যুষিত আজমিরে বিপুল বাধাবিঘ্নের ভিতর তত্ত্বজ্ঞান প্রচারে রত ছিলেন। তাঁহার আগমনকালে দিল্লি ও আজমির চৌহান বংশীয় সম্রাট পৃথ্বিরাজের শাসনাধীন ছিল। খা'জার অপূর্ব যোগবল দর্শনে আজমিরের হিন্দুগণ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। রাজশক্তি খা'জার বিরোধিতায় সেজন্য হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। ১১৯২ খৃস্টাব্দে থানেশ্বরের মহাযুদ্ধে শেহাবদ্দীন ঘোরি দিল্লির এই শেষ হিন্দুসম্রাট পৃথ্বিরাজকে পর্যুদস্ত করিয়া উত্তর-ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু তার পূর্বেই দিল্লি ও আজমিরে তাপস খা'জার নিরস্ত্র হস্তে ইসলামের আত্মিক বিজয় সমাপ্ত হইয়াছিল। খা'জার সঙ্গীয় চল্লিশ-শিষ্যের শীর্ষস্থানীয় কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কা'কী যখন আরবি সা'নাগান গাহিতে গাহিতে খোদার ইশকে সমাধিস্থ হইতেন, তখন ভক্তির প্লাবনধারা শ্রোতামাত্রকেই তন্ময় করিয়া তুলিত, তা সে যে-ধর্মেরই হউক।

খা'জার জীবনেতিহাস বিচিত্র। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৩০ হিজরির ১৪ রজব (১১৩৬ খৃ.) চিশত নামক গ্রামে। তাঁহার পিতা খাজা গিয়াসউদ্দীন ছিলেন হুসায়েন বংশীয় সৈয়দ। তিনি চিশত হইতে হিজরত করিয়া খোরাসানে বসতি স্থাপন করেন। এইখানে মঈনউদ্দীনের শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য একটি ফলোদ্যান ও একটি সেচকল (Water mill) ব্যতীত অন্যকিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মঈনউদ্দীনের বাল্যশিক্ষক ইব্রাহিম কান্দুজি ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার সাহচর্যে মঈনউদ্দীন সংসারের প্রতি ক্রমশ অনাসক্ত হইয়া পড়েন। কিছুকাল পরে তাঁহার ফলোদ্যান ও সেচকল বিক্রয় করিয়া তিনি উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দেন এবং নিজে ফকির অবস্থায় বোখারায় চলিয়া যান। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ হিশামউদ্দীন বোখারির পাদমূলে বসিয়া সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেন এবং উহার মর্ম গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসায় অধীর হইয়া পড়েন।

অতঃপর মঈনউদ্দীন নিশাপুরের নিকটবর্তী হারুন নামক গ্রামে গিয়া খ্যাতনামা সিদ্ধপুরুষ খাজা ওসমান হারুনির নিকট চিশ্‌তিয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। মা'রেফাতের ক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। কথিত আছে, ওসমান হারুনি এককালে চিশত গ্রামে বাস করিতেন। এজন্য তাঁহার প্রচারিত তরিকা (সাধনপন্থা) চিশতিয়া তরিকা নামে খ্যাত। কুড়ি বৎসর কাল মঈনউদ্দীন গুরুসাহচর্যে অতিবাহিত করেন এবং গুরুসেবা করিয়া ক্রমশ নিজকে ভবিষ্যৎ কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করেন। ইহার পর গুরু তাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিয়া স্বাধীনভাবে আল্লা'র মহিমা প্রচারে বহির্গত হইতে অনুমতি দেন।

মঈনউদ্দীনের জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হইল। এইখান হইতে তিনি প্রথমে মক্কাধামে গমন করিয়া পুণ্যতীর্থ কা'বায় শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তারপর মদিনা, বাগদাদ, তাব্রিজ ও হামদান হইয়া তিনি ইস্‌পাহানে উপনীত হন। এইখানে সুফি কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। এই সাধুপুরুষ পরে হিন্দুস্তানে খা'জা মঈনউদ্দীনের ইসলাম প্রচারকার্যে তাঁহার প্রধান সহকারী হইয়াছিলেন।

ইরান ও মধ্যএশিয়া ভ্রমণান্তর মঈনউদ্দীন হিরাট ও সবজওয়ার হইয়া বলখে পৌছেন। পথে বহু উচ্চশিক্ষিত আলিম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তথা হইলে গজনী ও খাইবারের পথে তিনি লাহোরে পৌছেন। কথিত আছে ৫৮৭ হিজরিতে (১১৯১ খৃস্টাব্দে) গজনীতে অবস্থানকালে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন হিন্দুস্থানে গিয়া ইসলাম জারি করিতে। কিছুকাল লাহোর এবং দিল্লিতে অবস্থানের পর মঈনউদ্দীন আজমিরে গিয়া স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। দিল্লিতে স্বনামখ্যাত নিযামউদ্দীন আউলিয়া তাঁহার শিষ্য হন।

আজমির ছিল রাজা পৃথ্বিরাজের রাজধানী, কাজেই পশ্চিম-ভারতে ঐ সময় আজমিরের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। এখানে আসার পর অল্পদিনের মধ্যে খা'জা মঈনউদ্দীনের অসাধারণ তপঃবলের কথা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজমির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু খা'জা তাহাতে বিচলিত হইলেন না, শুধু বলিলেন—দেখা যাক। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন—সে দিন বেশি দূর নয় যখন এই রাজাকে বিদেশী নরপতির হস্তে বন্দি অবস্থায় সঁপিয়া দেওয়া হইবে।

ইতোমধ্যে পশ্চিম-ভারতে মুসলিমদের রণদামামা বাজিয়া উঠিল। পৃথ্বিরাজের জন্য ইহা ছিল মৃত্যু-বিষাণ।

দীর্ঘ ৪৫ বৎসর খা'জা মঈনউদ্দীন আজমিরে ইসলাম প্রচার করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা শিক্ষা দেন। তাঁহার অলৌকিক যোগবল ও চরিত্র-মাহাত্মের কথা দেশে-দেশে প্রচার হওয়ায় প্রতিদিন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ শত শত লোক তাঁহার দরগাহে আসিয়া দোয়া ও আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিত। তিনি বলিতেন, প্রকৃত দরবেশ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের বিপদের সময় তাহাকে নিরাশ করেন না। এইসব কারণে তিনি অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন। লোকে তাহাকে 'গরিব নেওয়ায' বলিত। তিনি আজীবন ধর্মকার্যে ও কঠোর তপস্যায় দিন কাটাইয়াছেন। তাপস-শ্রেষ্ঠ ফরিদউদ্দীন আত্তার তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, খা'জা মঈনউদ্দীন সপ্তাহব্যাপী উপবাসের পর প্রতি অষ্টম দিবসে একবার এফতারি করিতেন এবং তাহাও ৫ মিস্‌কাল ওজনের একখানি চাপাতি দ্বারা। ৬৩৩ হিজরির ৬ই রজব (১২৩৬ খৃ.) খা'জা আজমিরে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আজো অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া আছে।

মদগর্বিত পারসিক, তাতার ও পাঠানদের ক্ষাত্রশক্তির কলুষ যখন সনাতন ইসলামের নৈতিক আদর্শকে ম্লান করিয়া দিতেছিল, বিলাসব্যসন ও রাজসিক মত্ততা যখন জনসাধারণকে সত্যপথ হইতে স্খলিত করিতেছিল, তখন এইসকল সংসার-বিরাগী সিদ্ধপুরুষদের অন্তরেই ইসলামের অনাবিল সত্য কুসুমাশ্রিত মকরন্দের ন্যায় আত্মরক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য উহার পুনর্জীবনের সম্ভাবনাকেও জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

নিশাপুরের উষর বক্ষে আত্তারের পবিত্র সমাধি আজ পৃথিবীর সকল দেশের সহস্র সহস্র লোকের ভক্তি-অশ্রুতে নিষিক্ত হইতেছে। কিন্তু আত্তারের দেহত্যাগের পর দুইশত বৎসর এই সমাধিতে কেহ কোনো স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসানের উদারমতি সুলতান আবুল গাজী হোসায়েনের আদেশে উহার উপর প্রস্তরের এক সুদৃশ্য চত্বর নির্মিত হইয়াছে এবং প্রস্তরগাত্রে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা খোদিত হইয়াছে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

* 9 8 4 1 8 0 1 1 7 5 3 0 4 *